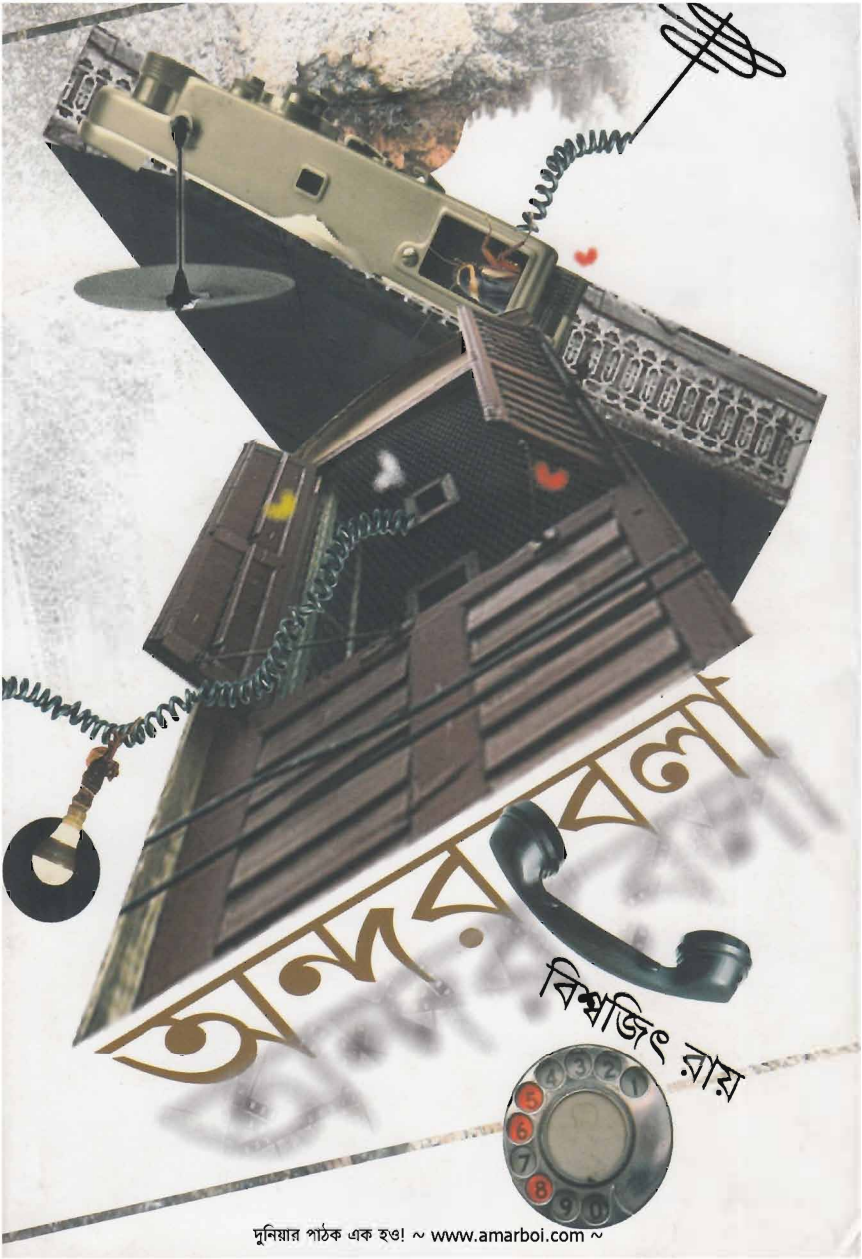

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বজিৎ রায় জন্মেছেন গত শতকের সাতের দশকের শেষের দিকে। ছোটোবেলা কাটিয়েছেন পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জল হাওয়া খেয়ে বড়ো হয়েছেন। পড়াশোনায় কৃতিত্বের জন্য পেয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক, গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মৃতিপদক। গবেষণার বিষয়: বঙ্গদেশে উচ্চ শিক্ষায় পাঠ্য হিসেবে বাংলা ভাষা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ। বর্তমানে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনারত। প্রবন্ধ, ব্যাক্তিগত গদ্য, আখ্যানের পাশাপাশি কবিতাও লেখেন। প্রকাশিত বই: *বাংলা ভাষাচর্চা / বঙ্গদর্শন থেকে সংকলন*, *স্মৃতি সত্তায় ভবিষ্যৎ*, *যত বেশি জানে তত বেশি মানে*, *ঘটিপুরুষ*, *বিচ্ছেদ প্রস্তাব*, ভালোবাসেন বই পড়তে আর ঘুমোতে।

প্রচ্ছদ: সৌজন্য চক্রবর্তী

১২৫.০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্দরবেলা

বিশ্বজিৎ রায়

প র শ প্র

s! ~ www

অ ন্দ র বে লা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্দরবেলা

বিশ্বজিৎ রায়

পরম্পরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Andorbela [Innerhood]
A book of personal essays
by Biswajit Ray

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৩

ISBN : 978-93-80869-56-8

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সৌজন্য চক্রবর্তী
স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : গৌতম দাশ

পরম্পরা প্রকাশন, ২০এ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ (৯৯০৩০ ৯১২২৫) থেকে প্রকাশিত
এবং ডি ডি এন্ড কোং, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।
e-mail : paramparaprakashan@yahoo.co.in
web : paramparaprakashan.com

১২৫.০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাল্লুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বাতিঘর, ভাষানগর, চির সবুজ লেখা পত্রিকায়। একটি রচনা সংকলিত হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত সুবর্ণ স্মরণিকা গ্রন্থে। লেখাগুলিকে এক-মলাটে ধরা হল কেন তা এ বই পড়লেই টের পাওয়া যাবে। আমাদের যাদের বয়স ত্রিশের কোঠায় তারা খুব দ্রুত কত জিনিসকে যেতে আসতে দেখলাম। সেই সবের ব্যয়, ব্যবহার নিয়েই আমাদের অন্দরবেলা ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে এগোচ্ছে। তারই নিহিত ছায়া ও ছবি এ লেখাগুলোয় ধরা রইল। পরম্পরা সেই সব ছায়া ও ছবিকে বিকিকিনির হাটে নিয়ে এলেন বলে, কেউ কেউ ইচ্ছে করলে তা পড়তে ও দেখতে পারবেন। পরম্পরাকে অনেকানেক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সেই সব সম্পাদককে যাঁরা এই লেখাগুলি প্রথম ছেপেছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিশ্বজিৎ রায়

অক্টোবর, ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

আইটেম	১১
জালালমারি	১৫
জাপানি টিভি আর কালো কাক	২১
ডিসি ফ্যান, চৌবাচ্চা আর মনাই	২৯
জুম	৩৩
বাথরুমেরা	৩৯
রান্নাঘর থেকে	৪৪
টেলিফোন	৪৮
সেফটিপিন	৫১
কন্ডোম	৫৪
দরজা	৫৯
ড. গুপ্ত	৬৩
হাফপ্যান্ট	৬৭
আদর	৭৩
সমুদ্রচশমা	৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইটেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইটেম সং ঠিক যতটা চকচকে
ঠিক ততোটাই তেলচিটে সেইসব জিনিসপত্র
তাদেরকে খুঁজে পেতে গুহাঘর থেকে বের করে এনে
পাশাপাশি রাখো যদি।

রঙিন ফটোশপে
সাদাকালো স্মৃতি মাঝে মাঝে জিতে যায়।

নিভে যাওয়া লণ্ঠনের ধোঁয়া
ইনভার্টারের নীরবতার পাশে
রেখে যায় মনখারাপের দাগ—
অসময়ের চায়ের জলে মিশে যায় স্টোভের গন্ধ
জিলেটের সটাসট রেজারের পাশে
ভিনদেশি বরফের মতো
লুঙ্গি-গেঞ্জি পুরুষের নরম গালের জন্য
অপেক্ষা করে ঘোলাটে ফটকিরি।
হাতের নোয়াতে রাখা সেফটিপিন
বাড়িতে হঠাৎ লোক এলে
হুক ছেঁড়া ব্লাউজের বুকের লজ্জা ঢেকে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাল-আলমারি

এক যে ছিল জালালমারি। রাসমেলার মাঠে শীত পড়ি পড়ি বিকেলবেলায় সেই জাল-আলমারির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার মায়ের। দরদাম করে কিনতে কিনতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। রাসমেলার আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিয়েছে—চাঁদের আলোয় আর হ্যাজাকের ছটায় টাটকা জাল-আলমারির চেহারা বড় খোলতাই লেগেছিল তার। গত শতকের আশির দশকের গোড়ায় মায়ের চোখে তখন কী স্নিগ্ধতা! একবার জাল আলমারির দিকে তাকায়, একবার তাকায় বাসনধুড়ো দোকানির দিকে। আশি টাকায় শেষমেশ রফা হয়েছিল।

মেলার মাঠের জাল-আলমারি ঠাঁই পেয়েছিল বাসাবাড়ির ঠাকুর ঘরে। নিতান্ত ছোটো সেই ঘরখানি! একদিকে ঠাকুরের দেয়াল লাগোয়া তাক। তাকের নিচে এ সংসারের ভাঁড়ার—চালের টিন, আটার বালতি। তারই একপাশে অন্যমুখে কোনওক্রমে ঠাঁই পেল জালালমারি। ও ঘরে মেঝে বলে প্রায় আর কিছু রইল না, যেটুকু রইল তাতে দাঁড়ানো যায়, বসা যায় না। পরদিন সন্ধেবেলা ঠাকুরকে ধূপ দেওয়ার সময় মা সেই ঠাকুর ছোঁয়ানো ধোঁয়া একবার ঘুরিয়ে দিয়েছিল জাল-আলমারির সামনে। ধূপের ধোঁয়া মেখে এ বাড়ির একজন হয়ে উঠল সে। এই ঘরদুয়ারে বসবাস শুরু হল তার—দুগ্গা দুগ্গা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেলে খেলার মাঠে বন্ধুদের সে বলেছিল জালালমারির কথা। গোটা পাড়ায় তখন একখানা ফ্রিজ—ডাক্তারকাকুর বাড়ি। পাড়ার যাবতীয় বরফ ওই ফ্রিজ থেকেই আসত। কেউ পড়ে গেলে, গরমকালে ঠান্ডা সরবত খাওয়ার ইচ্ছে হলে হাট করে খুলে যেত ডাক্তারকাকুর ফ্রিজের দরজা। তবু মনে হত তার, তাদের নিজেদের একখানা ফ্রিজ থাকলে বড় ভালো হত। অবশ্য তাদের দু'ঘরের বাসাবাড়িতে কোথায় রাখলে ভালো হয় সেই না-কেনা ফ্রিজখানা তা সে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারত না। জাল-আলমারিখানি ভাঁড়ার ঘরে ঢোকার পর মনে হল তার ওটাই সেই না-কেনা ফ্রিজের জায়গা। সেই জায়গায় এসে বসল আশি টাকার জাল আলমারি। ডাক্তারকাকুরা বড়লোক বলে ফ্রিজ কিনেছে—যাদের তত পয়সা নেই জাল-আলমারিই বোধহয় তাদের ফ্রিজ। মা, বাবার কাছে ফ্রিজের কথা বলেছিল বটে, কিন্তু জানত সে, হাজার হাজার টাকার ফ্রিজ কোনওদিন ঢুকবে না তাদের ঘরে। কারণ মরা হাতির দাম লাখ টাকা। আর লাখটাকার থেকে কয়েক ধাপ নিচে নামলে তবে হাজার টাকার সীমা শুরু হয়। সেই সীমায় তার বাবা কোনও দিন পৌঁছতে পারবে না। না পারুক ধূপের ধোঁয়া মেখে লক্ষ্মীমন্ত জাল-আলমারি তো তাদের ঘরে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বা কম কী! তার অনেক বন্ধুর বাড়ি জাল-আলমারিও নেই। তাই বিকেলের খেলার মাঠে সাতকাহন করে বলেছিল সে জাল-আলমারির কথা।

অবশ্য ঠাকুর যে ছোটোদের কথা শোনেন এটা সে টের পেল। জাল-আলমারিই যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফ্রিজ হয়ে উঠতে পারে এটা বোঝা গেল পরের গ্রীষ্মকালেই। ফ্রিজে রাখা দুধ বেড়াল খেতে পারে না, জাল আলমারির মধ্যে রাখা দুধও বেড়ালের অধরাই থেকে যায়। তবে সবচেয়ে বড় কথা ফ্রিজের মধ্যে বাসি খাবারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো থাকে। আর কৌশল করে রাখতে পারলে জাল-আলমারির মধ্যেও খাবার একদিন টাটকা থেকে যায়। ঠাকুর ঘরের সেই জাল আলমারিখানি তার চোখের সামনেই কাজে কম্মে ক্রমশ খানিকটা ফ্রিজ হয়ে উঠল।

মস্ত বড় একটা কলাইয়ের থালা। সেই থালাখানিতে মা প্রথমে কুঁজোর ঠান্ডা জল ঢালল। তারপর সেই থালাখানির আধখানা যখন ভরে উঠল জলে তখন সেই থালার উপরে মা স্থাপন করল একখানা বড় কাঁসার বাটি। সেই বাটিরও আধখানা ডুবে গেল জলে, আধখানা জেগে রইল জলের উপর। সেই বাটির ওপর রাখা হল বেঁচে যাওয়া তরকারির কাঁসি। তারপর সেই কলাইয়ের থালা, কাঁসার বাটি আর তরকারির কাঁসিকে খুব সাবধানে একসঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হল জাল-আলমারির মধ্যে। ও আলমারি তো নিরেট নয়, তার বুকে পেটে জালের জামা। সেই জামায় অজস্র ফুটো। সেই সব ফুটো দিয়ে বেড়াল গলতে পারে না, পোকারা ঢুকতে পারে না, শুধু চালাচল করতে পারে হাওয়া। সেই হাওয়া কলাইয়ের থালার ঠান্ডা জলে খেলা করে। সেই জল-ছোঁওয়া হাওয়ায় তাজা থাকে বেঁচে যাওয়া তরকারি। বাসি হয়, কিন্তু পচে যায় না—পুরো একদিন প্যাচপ্যাচে গরমেও বড় তাজা থাকে ওই তরকারি। এভাবে জাল আলমারিই মাঝে মধ্যে করে ফেলে ফ্রিজের কাজ। মনে হয় তার, বড়লোকের থাকে ফ্রিজ, গরিবের থাকে জাল-আলমারি। তবু তো গরিবেরা ঠিক বড়লোক নয়। পার্থক্য থাকেই—জাল-আলমারিও কোনওদিন পুরোপুরি ফ্রিজ হয়ে উঠতে পারে না। তাকে ফ্রিজ হয়ে উঠতে দেয় না কালো কালো বড় বড় আরশোলা। ঠাকুরের তাকের নিচে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা চালের টিন আর আটার বালতির মাঝে আরশোলাদের পাড়া। কুঁচো, মেজো, বড় সপরিবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। তারাও টের পেয়েছিল এ ঘরে নতুন কিছু একটা ঢুকেছে। একতলার বাড়িঘর ছেড়ে এই নতুন উঁচু জিনিসখানার ভেতর ঢুকে পড়া যায় কিনা একথাটা আরশোলাদের রাজা একবার ভেবেও ছিল। কিন্তু ঢুকতে পারেনি। শুঁড় বুলিয়ে বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিল কোথাও ভেতরে ঢোকার ফুটো আছে কি না। প্রথম প্রথম পায়নি। নতুন কেনা জাল-আলমারির গায়ে তখনও আরশোলা ঢোকার ফাঁক তৈরি হয়নি। কিন্তু ওই দম বন্ধ ছোট্ট ঘরে থাকতে থাকতে রাসমেলার আলমারিখানি শুধু হাওয়াকেই তার শরীরে প্রবেশাধিকার দিল না, আরশোলাদেরও দিল। যে ছিটকিনি দিয়ে আটকানো হত জাল-আলমারির পাল্লা, সেই ছিটকিনি, কয়েক মাস যেতে না যেতেই একটু আলগা হয়ে এল। যে পেরেকখানি দিয়ে আটকানো ছিল ছিটকিনি, বারবার বন্ধ খোলার ফলে তা আর তত শক্ত রইল না। ছিটকিনি লাগালে পাল্লা দুটো আটকে যায় বটে, তবে সামান্য ফাঁকও থাকে। সেই ফাঁক দিয়ে বেড়াল ঢুকতে পারে না, এমনকী টিকটিকিও কাজেই ওই ফাঁকটুকু নিয়ে মা মাথা ঘামায় না। শুধু একদিন গভীর রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আরশোলাদের রাজা আস্তে আস্তে জালালমারির গায় খুব নরম করে তার শুঁড় বোলাতে শুরু করে। সেই শুঁড় বোলাতে বোলাতে, জাল আলমারির গা বেয়ে বিনা বাধায় ওপরে উঠতে উঠতে সে এক সময় খুঁজে পায় ছিটকিনির ফাঁক। কেউ কিছু জানার আগেই সে ঢুকে পড়ে আলমারির বুকের খাঁজে। তারপর চুপ করে বসে পড়ে জাল আলমারির ওপরের তাকে। শান্ত ও স্থির।

এই আরশোলারাই ক্রমশ ফ্রিজের মহিমা থেকে জাল-আলমারিকে নামিয়ে আনে নিচে। আরশোলাদের রাজার পিছু পিছু ক্রমে ক্রমে অন্যরাও ঢুকে পড়ে সেখানে। তারা বুঝতে পারে এ আশ্রয় বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপদ। বিশেষত এই আশি টাকার জমিতে রয়েছে নানা নিরাপদ অসমান কেঠো খাঁজ। সেইসব খাঁজে ঢুকে পড়লে মানুষেরা তাদের দেখতেও পায় না। এই ভাঁড়ার ঘরে এমনিতেই আলো কম। তাছাড়া ফ্রিজের মতো কোনো বৈদ্যুতিক আলো তো এই কেঠো অন্দরে নেই। ফলে তাকের ওপরে খাঁজে খাঁজে কালো আরশোলারা মুখ লুকোলে কে আর দেখতে পাবে তাদের? তাছাড়া এখানে খাবারেরও অভাব নেই। তাকে খাবারের বাসন কোসন রাখতে গেলে একটু আধটু তো পড়বেই। সেই সব অবশেষে দিব্যি পেট ভরে যায় আরশোলাদের।

অবশ্য কোনও খবরই বোধহয় শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না। শরৎকালের শিশিরমাখা রাত্তিরে আরশোলাদের রাজা ঢুকে পড়েছিল অসমান কেঠো আলমারিতে। এ বছর দেরি করে পুজো এসেছিল। তাই শরতের গোড়া থেকে শুরু করে মাসখানেক বড় আরামে কেটেছিল আরশোলাদের রাত্রিদিন। নিরাপদ নিশ্চিন্ত। শেষ শরতে পুজোর ঠিক আগে তাদের সেই বাসা ভেঙে গেল। প্রত্যেক বছর পুজোর আগে বাড়িঘর পরিষ্কার করে মা। যে বাবা মাকে ফ্রিজ কিনে দিতে পারেনি সেই বাবা এক শেষ শরতের রবিবারে খুব সাবধানে পাল্লাবন্ধ খালি জাল-আলমারিটিকে ঘরের বাইরে খোলা উঠোনে নিয়ে এল। পূর্ণিমালাগা রাসমেলার মাঠ থেকে প্রায় একবছর আগে ছোট্ট এই ঘরে ঢুকেছিল সে। প্রায় একবছর অন্দরে থাকার পর এই তার বাইরে আসা। জ্যোৎস্নায় নয় শরতের নরম রোদে খুলে ফেলা হল তার পাল্লা। হাঁড়ি ভর্তি করে নিয়ে আসা হল গরম জল। তার চামড়ার তেলচিটে দাগ ও ময়লা মুছে ফেলার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হল সোডা-সাবান। সেই সোডা-সাবানের ওপর আস্তে আস্তে ঢালা হল গরম জল। মা গরম জল ঢালছে আর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা পরিশুদ্ধ একখানা ঝাঁটা দিয়ে ঘষছে তার খাঁজগুলি। রোদ সাবান আর গরম জলের ছোঁয়া পেতেই আরশোলারা বুঝতে পারল বিপদ আসন্ন। দলে দলে বাইরে এল তারা। পিল পিল করে ছড়িয়ে পড়ল উঠোনে। মণ্ডপে মণ্ডপে দুর্গাঠাকুরের আবাহনের আগেই সে বছর বিসর্জনে গেল আরশোলার দল।

শেষ বিকেলে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা পাল্লা-খোলা পরিষ্কার জাল-আলমারির দিকে তাকিয়ে মনে হল তার, রাসমেলার পূর্ণিমালাগা কেঠো আলমারিটি বড় একা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাপানি টিভি আর কালো কাক

এক যে ছিল জাপানি টিভি। সে একদিন হাজির হল দু'ঘরওয়ালা এক বাড়িতে। সেই বাড়িতে থাকত একটা বড়ো ছেলে, আর তার ভাই। আর থাকত তাদের বাবা-মা। মানুষজন ছাড়া থাকত খাট, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল, জলের কুঁজো, চানের গামলা, কালো ট্রাঙ্ক, তোলা উনুন, থালা-বাটি, বাজারের ব্যাগ। আরও অনেক টুকিটাকি—এক পলকে তাদের দেখা যায় না, জানাও যায় না।

ও বাড়ির বাবা-মা দোকানে গিয়ে তাকে অনেকের মধ্য থেকে পছন্দ করেছিল। পছন্দ হল বলে দোকানদার শো-কেস থেকে নামিয়ে টিভিকে বাক্সে ঢোকাল। বাবা-মাও রিকশা ডেকে উঠে বসল। দোকানের ছেলেটা খুব সাবধানে তাকে রাখাল বাবা-মায়ের কোলের মাঝবরাবর। আসলে সে তো বাক্স সমেত বেশ বড়োসড়ো, ডাগর-ডোগর। একজনের কোলে জায়গা হবে না। তাই তাকে রাখতে হল দু'জনের কোলে। বাবা, বিশেষ করে মা তাকে জাপটে ধরে বসে থাকল, পাছে সে পড়ে যায়। পড়লেই তো ভেঙে খানখান। গ্যারান্টি পিরিয়ডের মধ্যে খারাপ টিভি বিনা পয়সায় সারানো হয়, কিন্তু টিভি ভাঙলে তো আর সারানো হয় না।

দোকানের সামনে একটা বাঁধানো ঢালু রাস্তা। সেই ঢালু গলিপথ গিয়ে পড়েছে বড়ো রাস্তায়। সেই রাস্তায় বাস চলে, ট্রাক চলে, সাইকেল রিকশাও চলে। বড়ো রাস্তার দু'পাশে দোকান। ছোটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলা শহর। পুজো আসছে। তাই কেউ কিনছে জামা কেউ কিনছে জুতো। মাঝে মাঝে কারেন্ট চলে যাচ্ছে। রঞ্জিত স্টোর্স বলে একটা দোকানে খুব ভিড় জমেছে। সেখানে একটানা গোঁ গোঁ শব্দে জেনারেটর চলছে। রিকশা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। বাবার রোববার দুপুরে ঘুমের অভ্যেস। আজকে টিভি কিনতে গিয়ে ঘুম হয়নি বলে একটু ঢুলেছে। মা হাঁই হাঁই করছে। সাবধান। সামলে সামলে। ঘুমিয়ো না। টিভি পড়ে যাবে। যা হোক, শেষে টিভি এল দু'ঘরের সেই বাড়ি। এ বাড়ির বড়ো ছেলেটা রোগা, ছোটো ছেলেটা মোটা। বড়ো ছেলেটা শান্ত, ছোটো ছেলেটা দুরন্ত। বড়ো ছেলেটা ফরসা, ছোটো ছেলেটা ময়লা। আর টিভিটা সাদা-কালো।

এ বাড়ির দুটো ঘরের মাঝখানে ছিল একটা দরজা। মাঝদরজা ছিল বলে এ ঘর দিয়ে ঢুকে ও ঘর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যেত। টিভি সে কথা জানত না। দরজার কথা পুরোটা জানত ও বাড়ির বড়ো ছেলে, খানিকটা জানত ছোটো ছেলে। দু'ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে বড়ো ছেলে ছোটোবেলায় ছুটোছুটি করত। ওই মাঝদরজা দিয়ে ছোটো ছেলে হামা টানত। ওর হামা টানা শেষ হতে না হতেই এক শরৎকালে দুই ঘরের মাঝের দরজা গেল বন্ধ হয়ে। বন্ধ দরজার খাঁজে এসে বাসা বাঁধল একখানা মাঝারি মাপের আলমারি। সেই আলমারি আর দরজার মাথা অবশ্য সমান সমান নয়। আলমারিটা বেঁটে, দরজার মাথা লম্বা।

জাপানি কোম্পানির সাদা-কালো টিভি এবার এসে বসল সেই আলমারির মাথায়। আলমারি আর টিভি দুয়ে মিলে দরজার কাঠ গেল ঢেকে। দরজার মাথা আর দেখা যায় না। টিভির তলায় আলমারি। তার সামনে একচিলতে ফাঁক। নিচে তাকালেই টিভির

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা ঘোরে, চোখে পড়ে সিমেন্টের মেঝে। তারপর অবশ্য ঘরভরা খাট। সেই খাটের সঙ্গে লাগানো একটা বেঞ্চি। বেঞ্চি আর খাট যে আলাদা তা বোঝার কিছু উপায় নেই। তোশক আর গদি দিয়ে ঢাকা পড়েছে তাদের শরীর। সেই খাটে বসে কালো মোটা ছোটো ছেলে খুশিমুখে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল। টিভি মনে মনে বলল, বেশ বেশ। দ্যাখো দ্যাখো।

টিভি এল বটে, কিন্তু চলল না। কারণ তখনও অ্যান্টেনা আসেনি। অ্যান্টেনাকে দেখতে এমনিতে খুব খারাপ লাগে টিভির। কেমন একটা লাঠি-কাঠি চেহারা। শরীরে গোল বলে যেন কিছু নেই। লম্বা একটা লাঠি শরীর তার ওপরে অনেকগুলো কাঠি। আড়ে-বহরে লাগানো। অ্যান্টেনাকে এ কথা বললে সে ফ্যাকফ্যাক করে হাসে। বলে, ওরে, 'আমি ছাড়া তোর গতি নেই। আমি আছি বলেই তো তোর বুকের ওপর দিয়ে কত হাসি কত কান্নামাখা ছবি বয়ে যায় আর বাড়ির লোক তোর দিকে চেয়ে থাকে।' কথাটা টিভি ফেলতে পারে না। লাঠি-কাঠি অ্যান্টেনাকে তাই সইতেই হয়।

দু'ঘরের এ বাড়িতে অ্যান্টেনাকে নিয়ে পরদিন দোকান থেকে লোক এল। বড়ো ছেলে তার পিছুপিছু চলল ছাদে। অ্যান্টেনা ছাদে কোথায় থাকবে তা টিভি দেখতে পেল না বটে, তবে বাড়ির লোকদের কথাবার্তায় তার অনেকটাই বুঝতে পারল।

এ দু'ঘরের বাড়ির সামনে আছে আরও বড়ো লম্বা লম্বা টানা টানা দুটো ঘর। সেই ঘরগুলোতে কী যেন এক অফিস বসে। ঘড়ি বাজলে সকাল দশটায় অফিস জাগে, আবার ঘড়ি বাজলে বিকেল পাঁচটায় অফিস নিভে যায়। আর এই একতলার ওপরে আছে আর একটা তলা। সেই তলায় নাকি থাকে এই পুরো বাড়ির বাড়িওয়ালা। তার এক মেয়ে। ছেলে নেই। সেই মেয়ের রং ফরসা, মাথার চুল লম্বা কালো। দোতলার ওপরে আছে একটা লম্বা টানা রেলিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া ছাদ। সেই ছাদে আছে একলা একটা ঘর। সেই ঘরে পড়াশোনা করে ওই মেয়ে। সেই দোতলার ছাদের পড়া পড়া ঘরের মাথায় আছে আরও একটা ছাদ। সেই ছাদে ওঠা যায়, কিন্তু ওঠা নিষেধ। কারণ তার সবদিকে পাঁচিল নেই। পাঁচিল শেষ হওয়ার আগেই বাড়িওয়ালার টাকা গিয়েছিল ফুরিয়ে। সেই টাকা ফোরানো ছাদের না-শেষ হওয়া রেলিঙেই না কি একপায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যান্টেনা। আর তখনই ছুটতে ছুটতে নিচে এল এ বাড়ির বড়ো ছেলে।

টিভি রাতে খেয়াল করেনি, এখন সকালবেলায় খেয়াল করল এ ঘরের পাশে আছে সরু একটা গলি। সেই গলিতে আছে একটা আরও সরু নালি। সেই নালির লাগোয়া এই ঘর, ঘরের জানলা। নালির ওপরে থাকে রাশি রাশি মশা। সেই মশারা যাতে এ ঘরে ঢুকতে না পারে তার জন্য এ ঘরের নালির দিকের জানলা বন্ধ থাকে। আজ সেই জানলা গেল খুলে। ঘরে ঢুকল মশার পরে মশা। তবু বড়ো ছেলে ওই নালি-গলিতে দাঁড়িয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মা এসে চালিয়ে দিল টিভি।

টিভি জানে অ্যান্টেনা লাগলেও এখন ছবি আসবে না। ছবি আসবে সেই বিকেল সন্ধেবেলা। তখন টিভি সেন্টার খুলবে। এখন সকাল। তার বুকের ওপর ঝুলতে থাকবে শুধু ডোরাকাটা একটা পরদা। অথবা জেগে থাকবে সাদাটে একটা আলো। আর অ্যান্টেনা না লাগালে সেই সাদাটে আলোর বদলে তার বুকে মিহি শব্দ করবে অজস্র ফোঁটা ফোঁটা ঝিরি।

টিভি চালাতেই সেই ঝিরিরা শব্দ করে উঠল। আর তাদের নিকেশ করার জন্য বড়ো ছেলে পাশের সেই গলি থেকে হেঁকে উঠল—হয়নি। সেই হয়নি হাঁক বাড়িওয়ালার মেয়ের ঘর বেয়ে উঠে গেল আধন্যাড়া ছাদে। অমনি সেই ছাদে লাঠি অ্যান্টেনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠি ধরে খানিক ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে দিল দোকানের লোক। ঘোরাতেই টিভির বুকের থেকে হারিয়ে গেল ফোঁটা ঝিরির দল, চলে এল সাদাটে আলো। ব্যাস, তখনই ও ঘরের জানলা গেল বন্ধ হয়ে। শুধু ঘরে ঢোকা মশার দল কী করবে বুঝতে না পেরে পোঁ পোঁ বনবন করতে লাগল।

বনবনে সেই মশারা অবশ্য ঘরের মধ্যে চিরকাল রইল না, চলে গেল। মশার বদলে সেই ঘরে শুরু হল নানা লোকের আনাগোনা। এ পাড়ায় তো সবার ঘরে টিভি নেই। তারা মাঝে মাঝে হানা দিতে লাগল এ বাড়ির খাটে। তারা কেউ দেখে বাংলা সিনেমা, কেউ দেখে খবর, কেউ দেখতে আসে খেলা। যারা আসে তাদের কেউ ছেলে, কেউ মেয়ে, কেউ বুড়ো, কেউ বাচ্চা। টিভির খারাপ লাগে না। নানা সময়ে নানা মুখ চোখে পড়ে। বড়ো-ছোটো ছেলেরও ভালোই লাগে। তবে ওরা টের পায় বাবা-মায়ের মুখ ভার। এইভাবে দিন যায়। রাত যায়।

AMARBOI.COM

তিন

লাঠি অ্যান্টেনার কাঠিতে ইদানীং এসে বসে একটা কালো বাহারে বড়ো কাক। সেই কাককে টিভি চোখে দেখেনি, তবে সে যে এসেছে তা মাঝে মাঝে টের পায়। অ্যান্টেনায় সে বসলে টিভির বুকের ছবি দুলতে থাকে। বাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়। ছবি বেশি দুলতে থাকলে বড়ো ছেলে ছাদে যায়। দোতলার ছাদ থেকে তিনতলার ছাদের অ্যান্টেনায় বসা কাককে তাড়া লাগায়। কাকটা নাকি যেতে চায় না। শেষে ঢিলের ভয়ে পালায়। পালানোর সময় মাঝে মাঝে তার পায়ের চাপে অ্যান্টেনার কাঠি ঘুরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে টিভির বুক থেকে ছবিরা হারায়। তাতে টিভির একটু ফাঁকা ফাঁকাই লাগে। সন্ধেবেলায় দোকানের লোক অ্যান্টেনা ঠিক করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে চায় না। ফলে বাড়ির লোকেরা আর টিভি দেখতে পায় না। চুপ করে সন্ধে কেটে যায়। দুই ছেলেকে পড়, পড় আর বলতে হয় না। তারা এমনিই পড়তে বসে।

অ্যান্টেনার সঙ্গে কাকের সম্পর্কটা ক্রমশই পাকা হতে থাকে। ঘন ঘন কাক আসে। অ্যান্টেনার সঙ্গে তার এত কী কথা টিভির খুব জানতে ইচ্ছে করে। রাগও হয়। লাঠি যে এত কাঠি দুলিয়ে কথা বলতে পারে, টিভি তা আগে টের পায়নি। বিশেষ করে আকাশে যেদিন গোল থালার মতো চাঁদ ওঠে, সেদিন সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর মাঝরাতে কাকের ডাক ভেসে আসে টিভির কানে। পাখিটার কাণ্ডজ্ঞান নেই। চাঁদ দেখে বোকাটা ভেবেছে দিন। এসে বসেছে অ্যান্টেনায়। ঘুম ভাঙিয়ে গল্পো করছে তার সঙ্গে। আর অ্যান্টেনারও বলিহারি। কই, যখন দোকানের গুদোমঘরে তারা একসঙ্গে ছিল তখন তো এত কথা বলেনি।

বেশ একটু রাগই হয় টিভির। জেগে জেগে রেগেমেগে সে শেষ পর্যন্ত ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তার সেই রাগি ঘুমের মধ্যে এসে নামে একখানা স্বপ্ন, এক পা দু-পা করে। সেই স্বপ্নে লাঠি-কাঠি অ্যান্টেনাগুলো সব গোল গোল চাকার মতো হয়ে যায়। সাদা-কালো টিভি হয়ে ওঠে রঙিন। শহরে শহরে গজিয়ে উঠতে থাকে লাখ লাখ টিভি সেন্টার। বাড়িতে বাড়িতে টিভি। দিন নেই রাত নেই তারা পাঠাতে থাকে রাশি রাশি ছবি। সেইসব ছবি নাচতে থাকে টিভির বুকে, গাইতে থাকে গান। সারাদিন চলতে থাকে সে। নাওয়া-খাওয়া ভাবার ফুরসত নেই। টিভির আর লাঠি-কাঠি অ্যান্টেনার জন্য মনে তখন জায়গাও নেই, সময়ও নেই। কে কাকের সঙ্গে কথা বলল, আর বলল না তাতে তার বয়েই গেল। সেই স্বপ্নের মধ্যে তবু এসে পড়ে একখানা কাক। সেই কাক গোল অ্যান্টেনা দেখে তো অবাক। তার বসার জন্য কাঠি মেলে রাখত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে লাঠি বন্ধু সে গেল কোথায়! কিন্তু কিন্তু করে অচেনা ডিশের মতো শরীরে এসে ডানা জিরোয় সে। কথা জমে না। বসেও তেমন সুখ নেই। পা-টাও যেন কেমন পিছলে যায়। গোল অ্যান্টেনার থেকে কাক অন্য বসার জায়গার খোঁজে উড়ে যায়। নতুন বন্ধু চাই তার।

চাঁদনি রাত তখন প্রায় ভোর। টিভি জানে ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। আধো জাগায় তার মন তবু যেন কেমন করে ওঠে। আচ্ছা, কাক অ্যান্টেনার সঙ্গে যত পারে কথা বলুক। সেই কথার স্রোতে আর কাঠি দোলানোর ঘোরে তার বুক থেকে ছবি চলে গেলে যাক। ছবিহীন একা টিভি তবু অ্যান্টেনাকে মনে মনেও আর কিছু বলবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডি সি ফ্যান, চৌবাচ্চা আর মনাই

সাহেবরা চলে গিয়েছিল, রয়ে গিয়েছিল তাদের ব্যবহার করা নানা নিশান। সেই সব নিশানের ভাগীদার হল বড়ো, মেজো, ছোটো বাঙালি পুরুষ। বায়ুমণ্ডলে যেমন, ইতিহাসেও তেমন কোনও কিছুই ফাঁকা থাকে না—এক ভূত চলে গেলে আরেক ভূতের আগমন ঘটে, শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যায়।

স্বাধীন দেশ।

হগ মার্কেট থেকে নিউ মার্কেট।

সাহেবি কোয়ার্টারে বাঙালি মার্কেট সুপারিন্টেনডেন্ট। কাঠের ঘর, ফায়ার প্লেসের শূন্যতায় উঁচু উঁচু শিলিং আর শিলিং থেকে নেমে আসা দু'রকমের ফ্যান। গত শতকের আশির দশকের গোড়া। সে জানত লম্বা ডাণ্ডিওয়ালা ধীর লয়ে ঘোরা ফ্যানগুলো ডি সি ফ্যান, অপেক্ষাকৃত ছোটো আর চার পাঁচটা বাড়িতে যে রকম ফ্যান থাকে, সেগুলো এ সি ফ্যান। আর কোনও বাড়িতে সে কখনও ডি সি ফ্যান দেখেনি—এ বাড়িতে দেখল।

ঘোরে কিন্তু হাওয়া হয় না। হাওয়া হলেও গায়ে লাগে না। তাছাড়া ফুলস্পিডে ঘোরা এ সি ফ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখেছে সে, ফ্যানের চারপাশে দেবতার মাথার পিছনের মতো হাওয়া ভর্তি জ্যোতির্ময় এক বলয় খেলা করে। আর ডি সি ফ্যান? টিক্‌টিক্ করে ঘুরছে কোনও বলয় নয়, বৃত্তায়িত রেখা নয়, ধীর লয়ের পাখার ব্লেডে নীল কাচ দিয়ে আসা সূর্যের আলো পড়ে তৈরি হচ্ছে ঘরের দেওয়ালে নানা ছায়ার শরীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্ত বড় এক কাঠের ঘর।

নিঝুম দুপুর। গরম কাল। মার্কেট সুপারিন্টেনডেন্ট মেসোমশাই নিচে। মার্কেটে গেছেন। মা মাসিরা পাশের ঘরে গুলতানি মারছে, গরমের ছুটি ফুরিয়ে আসছে। কলকাতার দিন রাত এ গরমের মতো শেষ হয়ে যাবে। ফিরে যেতে হবে পুরুলিয়ায়। গরম। লোডশেডিং। এই কোয়ার্টারে আলো পাখা বড় একটা যায় না—কর্পোরেশনের বিশেষ ব্যবস্থাপনা। কোনও কারণে সেদিন দুপুরে চলে গিয়েছিল। ফুলস্পিডে ঘোরা এ সি পাখা ঝুপ করে থেমে গেল। ছিঁড়ে গেল বলয়ের গোল শূন্যতা। ডি সি ফ্যান থেকে তৈরি হওয়া ছায়ারা তখনও সচল—ওঠে, পড়ে, কাঁপে। এ সি কারেন্ট চলে গেছে, ডি সি আছে।

কেউ কেউ চলে গেলে কেউ কেউ থেকে যায়।

যারা থাকে তারা অনেক সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে বাধ্য হয়ে বাসা বাঁধে। সেদিন কিছুক্ষণ বাদেই সচল হয়েছিল এ সি ফ্যান, মনাইয়ের মা অবশ্য আর আসেননি। ইস্কুল খুলল আর অন্য জায়গা থেকে পাড়ায় এসে জুটল মনাই। শূন্যচোখ মনাই। মা মরা মনাই।

তাদের ছোটোবেলায় দুটো ধাঁধা খুব চালু ছিল। কোন চিল ওড়ে না আর কোন বাচ্চার মা নেই। প্রথমটার উত্তর দুটোর যে কোনো একটা—হয় আঁচিল, নয় পাঁচিল। দ্বিতীয় প্রশ্নটার কোনও বিকল্প উত্তর ছিল না। চৌবাচ্চার মা নেই— এটাই উত্তর।

পুলিশ ফাঁড়ির মাঠ, রোদ পড়ে আসছে। ফুটবল পিটিয়ে ওরা বাড়ি ফিরছে। দেবু বলেছিল, 'কোন বাচ্চার মা নেই।' বঙ্কা বলেছিল, 'চৌবাচ্চা'। রূপম বলেছিল, 'মনাই'। মনাই আগে আগে যাচ্ছিল। আর সেই ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলে না ওঠা বিকেল ডিঙনো গোধূলিতে তখন গোটা দলটা মনাইকে লক্ষ করে বলছিল—'মনাই একটা চৌবাচ্চা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের বাড়িতে বাথরুম আর পায়খানার মাঝখানে কাঠের ফ্রেম ছিল কিন্তু কোনও দরজা ছিল না। বাথরুমে এক ফোঁটা আলো ঢুকত না। দিনে রাতে যখনই বাথরুমে ঢুকতে হত তখন জ্বালতে হত চল্লিশ ওয়াটের একটা হলদেটে বাল্‌ব। পায়খানাতে প্যানের ওপরের দেয়ালে থাকত একটা না একটা মাকড়শা। সামনে থাকত একটা টিনের মগ। বাথরুমে ছিল একটা চৌবাচ্চা—বেশ বড়। চৌবাচ্চার পাড়ে থাকত গায়ে মাখা সাবান, সর্ষের তেল, নারকোল তেল। মা স্নান করে বাথরুম থেকে বাইরে আসার সময় মাঝেমাঝেই সেই চৌবাচ্চার পাড়ে ফেলে আসত সেফটিপিন। মায়ের হাতের নোয়ায় সবসময় দুটো সেফটিপিন ঝুলত। তার জামা প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেলে বা মায়ের ব্লাউজের হুক ছিঁড়ে গেলে সেফটিপিনই সম্বল।

তার মা খুব ভালো করে চৌবাচ্চার পরিচর্যা করত। তাই নিয়ে তাদের বেশ গর্ব ছিল। অন্যদের বাড়ির চৌবাচ্চার মতো তাদের বাড়ির চৌবাচ্চা নোংরা নয়। চৌবাচ্চার পরিচর্যা করা খুব শক্ত কাজ। মঙ্গলাদি রোজ গুনে গুনে কুয়ো থেকে দশ বালতি জল তুলে চৌবাচ্চা ভর্তি করত। চৌবাচ্চার পাশে চানের জন্য আলাদা করে তোলা থাকত তিন বালতি জল। পেচ্ছাপ পায়খানায় জল দিলেও সারাদিনে চৌবাচ্চার জল নিঃশেষ হত না। কমবেশি তলানি জল রোজই পড়ে থাকত। সেই পুরনো তলানি জলের ওপর নিত্যদিন নতুন জল ভরে আধশূন্য চৌবাচ্চাকে ভরিয়ে দিত মঙ্গলাদি। নতুন আর পুরনো জল মিশতে মিশতে ছ্যাতলা হত, পোকা হত, মশা হত—চৌবাচ্চায়। মা এক রবিবার বাদ দিয়ে দিয়ে চৌবাচ্চা পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাত।

পাড় থেকে সরিয়ে দেওয়া হল তেল সাবান। চৌবাচ্চার নিচে ছিল ছোট্ট গোলাকার একটা ফুটো। সেই ফুটোয় গোঁজা থাকত একটা ন্যাকড়া। মা কাপড়ের টুকরোটা সরিয়ে দিত। বেরিয়ে আসত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌবাচ্চার জল—বক্‌বক্‌ বক্‌বক্‌ করতে করতে। ছোট ছোট ঘূর্ণি তুলে বেরিয়ে যেত বাইরের নালা দিয়ে, মা জলশূন্য চৌবাচ্চায় মুখ আর বুক ঝুঁকিয়ে ঝাঁটা ঘষত। সেই ঘষাঘষির দাপটে ছ্যাতলা উঠে যেত। তারপর আবার গুঁজে দেওয়া হত নতুন একটা কাপড়।

কাপড় সবসময় ঠিকঠাক গোঁজা হত না। মঙ্গলাদি পরদিন নতুন তোলা কুয়োর জলে যখন ভর্তি করত পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে চৌবাচ্চা, তখন কোনও কোনও দিন দেখা যেত কাপড় গোঁজা ফুটো থেকে সরু ধারায় থির থির করে বেরিয়ে আসছে জল।

মা মরা মনাই ওই পাড়ায় তার দাদু-দিদার কাছে পুরো এক বছরও থাকতে পারেনি। বোধহয় মনখারাপ হত। ওরা অবশ্য অত কথা বুঝত না। পুলিশ ফাঁড়ির মাঠে, 'মনাই একটা চৌবাচ্চা' এটা সুর করে বলা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বছর ঘুরেছিল।

পরের গরম।

নিউ মার্কেটের সাহেবি কোয়ার্টারে থাকা বাঙালি মেসোর বাড়ি ছুটি কাটাতে গিয়ে সে দেখল ডি সি ফ্যানগুলো খুলে কাঠের ঘরের এক কোণে রাখা। ডি সি কারেন্টের দিন গেছে। মেসোমশাই পাখাগুলোকে এ সি-তে কনভার্ট করেননি।

কড়িকাঠে ফ্যানহীন লোহার আংটা।

সেই আংটায় ফ্যান ঘোরে না বলে আর কোনো ছায়াবাজি তৈরি হয় না।

ছায়াহীন নিরেট ঘরে একটা বিকেল পড়ে আছে।

ছেলেটি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। নিউ মার্কেটের কোয়ার্টারের সামনে সাহেবি আমলের গাড়িবারান্দা। নিচে রাশি রাশি চলমান হলুদ ট্যাক্সি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুম

হাতে এসেছে নতুন ক্যামেরা। উন্নত, প্রযুক্তির ম্যাজিকে কুশল। সুতরাং যত খুশি ছবি তুলি ছোটো পরিবারে সদস্যরা। খেয়ালও থাকে না অনেকসময় পৃথিবীর রূপ আর বয়সের থেকে ওই ক্যামেরার লেন্স ও স্মৃতির ভাঁড়ার ছোটো। ধরে রাখতে চাই প্রতিটি মুহূর্ত। হাসি, কান্না, বিষণ্ণতা, মেঘ, পাহাড়, নদী, বৃষ্টি—ইকো-ট্যুরিজম, বিদেশ সফর। ক্যামেরার ছবি চালান করি কম্পিউটারে। সেই সব উজ্জ্বল-মুহূর্ত রাখা থাকে ফেসবুকে, অর্কুটে। কী নিপুণ সামাজিক এইসব সোস্যাল নেটওয়ার্ক। বর্ষার গড়পঞ্চকোট চোখ ঝলসে দেয় আমেরিকাপ্রবাসী বন্ধুর। পুরুলিয়ার কাছে যে এমন বর্ষাঘন সবুজ পাহাড়ে মেঘের মাখামাখি দেখা যায় আজকাল প্রকৃতির বন-বাংলোয় বসে, সে কথা সে কখনও ভাবেনি। সত্যি তো এগোচ্ছে দেশ—আমাদের রাজ্য।

ও ক্যামেরায় ছবি তুলি আমার মায়ের। রান্নার পর এখনও আঁচলেই হলুদ-হাত মোছে মা। বাবা বিছানায়! দুবেলা নিয়মিত আসেন দিন ও রাতের সেবিকা। এ ক্যামেরায় জুম খুব ভালো হয়। দূরের জিনিস চাইলেই কাছে, দূর থেকে মা হাসলে তা অনায়াসে এনে ফেলা যায় সামনে। স্ক্রিন ভরে যায় মায়ের হাসি মুখের ছবিতে যদিও সে মুখ দূরেই থাকে। দিনের যেটুকু সময় বাবাকে বালিশ দিয়ে বিছানায় বসানোর চেষ্টা হয় সেই মূল্যবান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তটুকু কোনও কোনও উইক এন্ডে ক্যামেরায় ধরা পড়ে। তারপর পাঠানো যায় দাদার মেল-বক্সে। বিদেশে বসে সে অন্তত পেতে পারে বাবার স্বাস্থ্যের টাটকা বুলেটিন।

বাবা অবশ্য কোনোদিন মায়ের ছবি তোলেনি। তার মানে এই নয় বাবা ছবি তুলতে পারত না। আমাদের ছোটোবেলায় আলমারির লকারের ভেতর একটা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট রাখা থাকত। সেই প্যাকেটে ছিল সাদা-কালো অনেক ছবি আর নেগেটিভ। অবরে-সবরে আমরা সেই ছবির প্যাকেট খুলতাম। আমাদের ভাড়াবাড়ির বেঞ্চি লাগানো খাটের চাদর ভরে যেত সেই সব ছবির শরীরে। অধিকাংশই বাবার, বিয়ের আগে তোলা ছবি, বন্ধুদের সঙ্গে। কোনোটা অজন্তার, কোনোটা ইলোরার, কোনোটা কোনার্কের। সেটা কত সাল? আমার হিসেবে বাবা ছোটো ছোটো হরফে সেই সব ছবির পিছনে লিখে রাখত দিন আর তারিখ। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পঞ্চাশের দশক সেটা। মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে হয় পরে, ষাটের দশকে। পঞ্চাশের দশকে স্বাধীন ভারতে কোনার্কের বিশাল মিথুনমূর্তি আর ভাস্কর্যের সঙ্গে লগ্ন হয়ে ছবি তোলা যেত বোধহয়। তবে বাবা আর তার বন্ধুদের সেই সব ছবি নিবিড় লগ্নতার নয়। যেভাবে পর্বত আরোহীরা পাহাড়ে ওঠেন সেভাবেই বাবা ও তার বন্ধুরা সেই সব মূর্তিগুলির নানাস্থানে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের এই শৌর্যের প্রমাণ ওই সব ছোটো ছোটো সাদা-কালো ছবিতে নিপুণ ভাবে ধরা পড়েছিল। তবে বিয়ের পর আমার হিসেবি বাবা কিছুতেই ছবি রাখবার জন্য একটা অ্যালবাম কিনে উঠতে পারলেন না। ফলে আমাদের দেশের স্বাধীনতার বয়স যত বাড়তে লাগল তত সেই সব বীর্যময় ছবিগুলি একটার সঙ্গে আর একটা লেগে যেতে লাগল। খুব সাবধানে চেষ্টা করেও একের থেকে অপরকে একদিন আর আলাদা করা গেল না। ওপরের ছবিতে বাবা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচের ছবিতে হয়তো গাছে বা পাহাড়ে ওঠার কায়দায় বাবার কোনো বন্ধু মিথুন মূর্তির ঘাড়ে। এক ছবির থেকে অন্য ছবি আলাদা করা গেল না বলে দুই ছবির চিটচিটে একাত্মতা খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল বাবার মুখ। আর বাবার কবন্ধ শরীর সেই গাছে চাপার ভঙ্গিময় বন্ধুর ছবি শরীরে আটকে গেল।

বিয়ের পর বাবা ছবি না তুললেও মা টাকা জমিয়ে জমিয়ে একটা ক্লিক থ্রি ক্যামেরা কিনেছিল। অজটিল সাদা-কালো ছবি তোলার সেই ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ ছিল না। ফলে রাতের ছবি তোলা যেত না। জুম কাকে বলে সে কথা বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের তখন জানার কথা নয়। আর ওই কমদামি সাদা-কালো ক্যামেরা প্রযুক্তিগত কোনো জটিলতারই ধার ধারত না। এই ক্যামেরাতে মায়ের আর বাবার কয়েকটা ছবি তুলেছিল দাদা, আমার আর দাদার কয়েকটা ছবি তুলেছিল মা। বাবা আমার, দাদার আর মায়ের একটা ছবি তুলতে গিয়ে হাত কাঁপিয়ে ফেলেছিল। ফলে ফিল্‌ম ডেভেলপ করার পর যখন দেখা গেল বাবার তোলা ছবিতে ভূমিকম্প হয়েছে মা তখন বাবাকে গোবর গণেশ বলেছিল। লুঙ্গি পরা বাবার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। বাবা আর কোনোদিন ক্লিক-থ্রি ক্যামেরাতে একটাও ছবি তোলেনি।

তবে মায়ের সাদা-কালো কিছু ছবি তুলেছিলেন অখিলদা। সেই ছবিগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কেউ সচেতন ছিলাম না, তবে অখিলদার কথা জানতাম। বাবার তুলনায়, নিজের বড়ো জামাইবাবু ছাড়া আর যে কজন রূপবান গুণবান পুরুষের কথা বলত মা, তাদের মধ্যে অখিলদা ছিল সেরা। অখিলদা নাকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু। সৌমিত্র তখন নায়ক হননি। নাটক-টাটক করেন। অখিলদা নাটক করতেন, ভালো আবৃত্তি করতেন, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তেন, ধুতির ওপরে শার্ট পরতেন, কবিতা লিখতেন। সেই অখিলদা প্রেমও করতেন। মা গলা নামিয়ে বলেছিল অখিলদার সেই প্রেমিকা অন্য কার সঙ্গে চলে যায়। আর সেই বিট্রে সইতে না পেরে অখিলদা কেমন হয়ে যায়। নেশার ওষুধ ধরে। মা বলেছিল ঘুমের বড়ি। অখিলদার দাদা, মায়ের বড় জামাইবাবু কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করতেন। তখন ল্যান্সডাউন মার্কেটে পোস্টিং। দিদি জামাইবাবুর কোয়ার্টারে আইবুড়ো শ্যালিকা পড়তে আর থাকতে এসেছে। বিদ্যাসাগর কলেজে বি. এ. পড়ে। অখিলদা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া শেষ করেছে। একটা চাকরিতে ঢুকেছে। বড়ো জামাইবাবুই কাকে বলে কয়ে চাকরির ব্যবস্থা করেছেন, প্রাইভেট ফার্ম। অখিলদা কিন্তু 'আধেকদিন' সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে। আর ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমের বড়ি না দিলে অখিলদা বাড়ি মাথায় করে। ছোটো ছেলের কাণ্ড দেখে মা তাকে বড়ি দেয়। মার্কেট থেকে বাড়ি ফিরে ভাই আর মায়ের অবুঝপনা দেখে রেগে যায় বড়ো জামাইবাবু। কিন্তু অখিলদাকে তবু সামলানো যায়নি। মায়ের বড়ো জামাইবাবু চেষ্টার কিছু কসুর করেননি। ছোটো ভাইয়ের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন। নিজে আই. এ. পাশ। ভাই ভালো করে পড়াশোনা করুক এটা চেয়েছিলেন। হল না। প্রাইভেট ফার্মের চাকরিও টিকল না। না গেলে তারা আর রাখবে কেন! রাখল না। ভাইয়ের মন আর মাথা যাতে ঠিক হয় সে জন্য জামাইবাবু অখিলদাকে রাঁচিতে চিকিৎসার জন্য কিছুদিন রাখা হয়েছিল। অখিলদা নাকি খানিক ভালোও হয়েছিল। ওষুধ ইলেকট্রিক শক এসব করে বেশ ছিল, কিন্তু বেশিদিন আর থাকেনি। গলার নলি বঁটি দিয়ে কেটে ফেলেছিল অখিলদা।

এই অখিলদা যে মায়ের ছবি তুলেছিল একথা মা বলেনি। তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে কবিতা লিখেছিল একথা বলেছিল। 'আমি তো লজ্জায় মরি। অখিলদার তোলা মায়ের ছবিগুলো পাওয়া গিয়েছিল দিদিমার ট্রাঙ্কে। দিদিমা ট্রাঙ্ক খালি করার পর যার যা জিনিস তাকে তা দিয়ে দিচ্ছিল। মায়ের সাদা-কালো ছবিগুলো সেই সূত্রেই পাওয়া। খান পাঁচেক। বিয়ের আগে ল্যান্সডাউন মার্কেটের কোয়ার্টারে তোলা। মা ছবিগুলোর জন্য নিজেকে বেশ যত্ন করে সাজিয়েছিল বলে মনে হয়। বিয়ের আগে থেকেই মা ভুরু আঁকত। বিয়ের পর মাকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ভুরু আঁকতে দেখেছে তারা। এই ছবিগুলোতে মা চোখে কাজল পরেছে। বিয়ের পর মা কাজল পরত না। শুধু সাজ নয়, বহিরঙ্গেও কিছু রদবদল চোখে পড়ে। একটা ছবিতে টেবিল ল্যাম্পের ব্যবহার দেখার মতো, একটাতে বালিশকে বিশেষ ভঙ্গিতে ধরে আছে মা। খুবই আশ্চর্য দিদিমার ট্রাঙ্ক থেকে অতদিন বাদে বাইরে এলেও এই ছবিগুলো বাবার বিবাহপূর্ব ছবির মতো পরস্পরের গায়ে আটকে যায়নি। সে কি ছবির কাগজের গুণ! হবেও বা। অখিলদা বা মা কেউই যে বাবার মতো হিসেবি ও ইতিহাস সচেতন ছিলেন না তা বেশ বোঝা যায়। এই সাদা-কালো ছবিগুলোর পিছনে কোনো দিন বা তারিখ লেখা নেই। দিদিমা কার কাছ থেকে কীভাবে এই ছবিগুলো পেয়েছিল তা বলা মুশকিল। অখিলদা বোধহয় ছবিগুলো মাকে দেয়। মা বিয়ের আগে দিদিমাকে ছবিগুলো দিয়ে যেতে পারে। তারপর দিদিমা সেগুলোকে যত্ন করে ট্রাঙ্কে রাখে। অপঘাতে মরা মানুষের তোলা ছবি এমনিতে কেউ রাখতে চায় না। তবে দিদিমার বরও তো অপঘাতেই গিয়েছিলেন। অ্যাক্সিডেন্ট—টেবিল ল্যাম্পে শর্ট-সার্কিট। তিনি ছবি তুলতেন না ছবি আঁকতেন। দিদিমার একখানা পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। সেকালে নিজের বউয়ের পোর্ট্রেট আঁকা যথেষ্ট বেহায়াপনা বলে গণ্য হত। তাই সে ছবি ছিঁড়ে ফেলতে হয়। অখিলদার তোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবিগুলো যত্ন করে ট্রাঙ্কে তুলে রাখার সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা নিশ্চিত করে কে বলবে!

অখিলদার কোনো ছবি অবশ্য আমরা দেখিনি। পুরনো ফাটা ছেঁড়া যেমন হোক একটা হলেই হত। প্রযুক্তি এখন বড়ই কুশল। পুরনো ছবিকে যে কত ভাবে মেরামত করা যায়। কিন্তু প্রযুক্তির কাছে ধরা দেবার জন্য সবাই তো আর ছবির শরীরে নিজেকে বন্দী করে রাখতে চান না। আর ছবি থাকলেও সেসব যে কত ভাবে হারিয়ে যায়। এখনকার মতো সেভ করার নানা কৌশল তো ছিল না। মাকে জুম করে কাছে নিয়ে আসি, বাবাকেও। কিন্তু জুম করলেও কি সব কিছু কাছে আসে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাথরুমেরা

সাহেবরা চলে গিয়েছিল কিন্তু ফেলে গিয়েছিল তাদের ব্যবহৃত বাথরুমগুলি। এক বাড়িতে একসঙ্গে অতগুলো বাথরুম দেখে সে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আর সে সব বাথরুম বলে বাথরুম! তাদের ভাড়াবাড়ির ভাঁড়ার ঘর এমনকী শোবার ঘরও হয়তো তলিয়ে যেতে পারে সেই সব বাথরুমের শরীরে।

সাহেবি আমলের মার্কেটের সেই মার্কেটের ওপরে মার্কেট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোয়ার্টার। সেখানে এখন থাকেন কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরিজীবী—বাঙালি সাহেব। সেই কোয়ার্টারে বড়ো বড়ো ঘর আর অনেক অনেক বাথরুম। অন্তত তিনখানা বাথরুমের কথা তো মনেই আছে তার। একখানা বাথরুম ছিল তার বড়ো মেসোমশাইয়ের শোবার ঘরে। লম্বাটে ঘর। সেই ঘরে চারখানা খাট। দুই মাসতুতো দাদার দুটো—আর বাকি দুটো মাসি মেসোর। মেসোমশাইয়ের পায়ের কাছে টিভি আর টিভি থেকে একটু এগিয়েই স্নানঘর। এই বাথরুমের অবশ্য পায়খানা নেই। শাওয়ার আছে, কল আছে, বালতি ও মগ আছে। আয়না চিরুনি ও তোয়ালে আছে। তোয়ালে ঝোলাবার স্ট্যান্ড আছে। জমাদার আসবার পিছ দরজা আছে, কিন্তু পায়খানা নেই। ফলে খুব হিসু পেলেও এই বাথরুমে যাওয়া যেত না। আসলে এই বাথরুমটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়মেসো ছাড়া আর কারো যাওয়ার হুকুমই ছিল না। মার্কেটে অফিসে যাওয়ার আগে বড়োমেসো ওই স্নানঘর থেকে খালি গায়ে তোয়ালে আর চটি পরে বেরিয়ে আসত। জাতবৈদ্য বড়োমেসোর কানে ঝুলতো ভিজে পইতে। সে একবারই ওই বাথরুমে ঢুকতে পেরেছিল। পারার কথা নয়, তবু পেরেছিল। একদিন দুপুর বেলায় তার খুব হিসি পায়। যখন হিসি পেল, তখন আর দুটো বাথরুমে লোক ছিল। লোক মানে আত্মীয়স্বজন। প্রত্যেক বছরের মতো সে বারও আত্মীয়দল মেরি ক্রিসমাসের আগে হাজির হয়েছিল নিউমার্কেটের সেই কোয়ার্টারে। বাড়ি ভর্তি লোকজন। বাথরুম খালি পাওয়া মুশকিল। কারণ বাকি দুটো বাথরুমের একটা দুই মাসতুতো দাদার। সেটাতেও অন্যদের যাওয়া নিষেধ। কাজেই শ্বেতপাথরের টেবিলওয়ালা রান্নাঘর সংলগ্ন খাবার-ঘরের বাথরুমখানাই সবার জন্য বরাদ্দ ছিল। তার হিসু প্রায় হয়ে যাচ্ছিল বলে তাকে ওই একবারের জন্যই বড়োমেসোর বাথরুমে ঢুকতে দেওয়া হয়। ওই বাথরুমের জমাদার আসার দরজাটা ছিল বাথরুমের যে দেয়ালটা শোবার ঘরের দিকে তার উলটো দেওয়ালে। সেই দরজা খুললেই একটা ঢেউ খেলানো চাতাল। সে চাতাল পথে জমাদার বাথরুম পরিষ্কার করতে আসত। তার মা তাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে ওই জমাদারের দরজাটা খুলে দেয়। আর সে জমাদার আসার চাতালের ওপর নির্বিঘ্নে হিসি করতে থাকে। এতে বড়মেসোর বাথরুম তার হিসুর স্পর্শ ও গন্ধে ভরে ওঠেনি। বাইরের চাতালে হিসু করার পর যখন তার পায়ের পাতার শুদ্ধীকরণের জন্য জল ঢালা হচ্ছিল তখন আড়চোখে সে বাথরুমের অন্দরসজ্জা দেখে ফেলে। তার মা অসময়ে হিসি পাওয়ার জন্য তাকে বকাবকিও করে। জমাদার আসার ওই চাতালপথে একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকুতোভয়ে চলাফেরা করত। সে বড়োমেসোর কুকুর লালু। মার্কেটের মাথা বা ছাদ ওই চাতাল—দীর্ঘ, ঢেউ খেলানো। ছোটাছুটির জন্য হাগু ও হিসু করার জন্য সত্যি অনেকটা জায়গা পেত ওই সুভদ্র কুকুর। জমাদারের বাথরুম পরিষ্কার করতে আসার ওই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মা। ও স্নানাগারে তার প্রবেশের কথা বড়োমেসোকে কেউ বলেছিল বলে মনে হয় না।

দুই মাসতুতো দাদার জন্য বরাদ্দ বাথরুমখানি ছিল বসবার ঘরের লাগোয়া। ফোন রাখার স্ট্যান্ডের ঠিক পাশে। এই বাথরুমে দুই মাসতুতো দাদা ছাড়াও একটু বড়ো হবার পর প্রবেশাধিকার পায় তার দাদা। সে ছিল মাসতুতো দুই দাদার মধ্যে ছোটোজনের পিঠোপিঠি। শীতের কলকাতায় তারা একসঙ্গে ইডেনে খেলা দেখতে যেত। তার দাদা যে বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল তার দু-বছর আগে ছোটো মাসতুতো দাদা কলকাতার এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেছিল। তার নিজের দাদা জেলা শহরের এক বাংলামাধ্যম মিশনস্কুলের ভালো ছাত্র ছিল। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল। কাজেই নিউমার্কেটের বসার ঘরে ফোনের স্ট্যান্ড লাগানো দেয়ালের পাশের বাথরুমের তার দাদা ঢুকতে পেরেছিল।

এই বাথরুমে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটাত মাসতুতো বড়োদাদা। ঘন্টা দেড়েক তো বটেই। দিনে একবার নয় বার তিনেক স্নান করার অভ্যাস ছিল তার। শেষবার বাথরুমে যেত রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে হাফপ্যান্ট আর একটা ফিনফিনে ফতুয়া পরে বাইরে আসত ভুটুদাদা। সোজা এসে দাঁড়াত শোবার ঘরে, একটা র‍্যাকের সামনে। সেই র‍্যাকের ভেতরে ছিল কালীঘাট থেকে কেনা ঠাকুর দেবতার দল। ভুটুদাদা তাদের ধুপ দিত। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে দাঁড়াত ড্রেসিং টেবিলের সামনে। মুখে বুটি-বুটি করে ক্রিম মাখত। আর আয়নায় নিজের সেই বুটি-বুটি ক্রিমমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে দুলতে থাকত। তার সদ্যস্নান করা হাফপ্যান্ট পরা পা তাল ঠুকত।

মাসতুতো ছোটোদাদা অবশ্য অতক্ষণ বাথরুমে থাকত না। সে শুনেছিল মাসতুতো দাদাদের ওই বাথরুমে কমোড আছে। খাবার ঘরের বাথরুমে অবশ্য কমোড ছিল না। গত শতকের আশির দশকে সাধারণ বাঙালির নিত্য অভ্যাসে কমোড বেশ অস্বস্তিকর বস্তু হিসেবেই পরিগণিত হত। কাজেই মাসতুতো দাদাদের ওই নাকি কমোড বাথরুমখানি, যাতে কেবল তাঁরা দাদা অতিরিক্ত হিসেবে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল, সবদিক থেকেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। একদিন দুপুর বেলায় সে হঠাৎই ওই বাথরুমে প্রবেশাধিকার লাভ করে। কারণ হিসু নয় অসময়ের হাগু। বাথরুমটি ইংরাজি এল অক্ষরের মতো। এল-এর লম্বা দিকটি স্নানাগার, ছোটোদিকে কমোড। এখন সে বড় হয়ে বুঝতে পারে আসলে ওটা ছিল অ্যাংলো। ওই বাথরুমে সে আশ্চর্য এক নতুন জিনিস দেখতে পায়। একটা আলমারি—দেয়ালে লাগানো, কাঠের। খুব বড় নয়। সেটা সাহেবি আমলের কি না কে জানে! আর তাছাড়া সাহেবরা অনেকদিন চলে গেছে। ওই বাথরুমেরও একাধিকবার মালিকানা বদল হয়েছে। তবে ওই কাঠের শেলফ যাদের বানানোই হোক না কেন ভরা ছিল সিনেমার নায়িকাদের ছবিওয়ালা পত্রিকায়। তাদের ঢাকা-খোলা শরীর ওই নিঝুম বাথরুমের এল-এর ছোটোহাতের শেলফে ঢাকা-খোলা থাকত। ভুটুদাদা আজীবন অবিবাহিত, অন্যজন দেরি করে বিয়ে করে। তবে পরিণত জীবনে অতবড়ো বাথরুমের মালিকানা তাদের আর জোটেনি। ফ্ল্যাটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাথরুম তো ছোটোই হয়। সাহেবি মার্কেটের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বড়মেসো ফ্ল্যাটে চলে আসে। তার অবসরের আগেই সেই চাতালেই একদিন মারা গিয়েছিল লালু। পরিণত বয়সে। জমাদার পিছ-দরজার গোড়ায় তাকে আবিষ্কার করে। র‍্যাকের ঠাকুরেরা ফ্ল্যাটে এসেছিল। ফ্ল্যাটের বাথরুম ছোটো হলেও আজও রাত্রিস্নানের পর দেওয়ালের আয়নার সামনে দুলতে দুলতে দাঁড়িয়ে থাকে ভুটুদা। সদ্যস্নাত হাফপ্যান্ট পরা পা তাল ঠুকতে থাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাঘর থেকে

টুনুদির মাকে তার জেঠিমা বলার কথা, কিন্তু সে মিনাম বলে ডাকত। মিনাম শব্দের অর্থ কী তা বলা মুশকিল। আদপেই হয়তো কোনো অর্থ নেই। শুধুই একটা শব্দ, যা ছেলেবেলায় বানিয়ে নিয়েছিল সে। এমন তো অনেকেই বানায়।

মিনামের একটা মস্ত বড় রান্নাঘর ছিল। সেই রান্নাঘরের একদিকে ছিল দুটো সিঁড়ি। একটা নিচে নামার, অন্যটা ওপরে ওঠার। আসলে দুটোই ওপরে ওঠার সিঁড়ি কিন্তু রান্নাঘর থেকে দেখলে একটাকে নিচে নামার আর অন্যটাকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি বলে মনে হত। নিচে নামার সিঁড়িটা গিয়ে পড়েছিল পিছনের কুয়োতলার বাগানে, ওপরে ওঠার সিঁড়িটা গিয়ে থেমেছিল তিনতলার ছাদের ঘরে। টুনুদি ওপরে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে ছাদের ঘরে পড়তে চলে যেত। জেঠু নিচের নামার সিঁড়ি দিয়ে হাজির হত কুয়োতলার বাগানে। খালি গা, মুখে বিড়ি, পরনে লুঙ্গি। কুয়োতলায় মঙ্গলাদি বাসন মাজত, কাপড় কাচত। সেই জল, কাজের বালাই মিটলে কুয়োতলার নালি বেয়ে এসে জমা হত বাগানের একদিকে। জেঠুর মনে হত ওই জল সারা বাগানে ছড়িয়ে পড়া ভালো। তাই তাকে শাগরেদ করে জেঠু কোদাল আর খুরপি দিয়ে সারা বাগানে কেটে ফেলত অজস্র কাঁচা নালি। কুয়োতলার পাকা নালি থেকে যেখানে জল এসে পড়ত সেখানেই কাটা হত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল কাঁচা নালিখানি। তারপর সেই নালি থেকে বাইরে আসত উপনালির দল। সেই সব নালিপথে কুয়োতলার জল হাজির হত নানা গাছের শিকড়ে। এই জলখেলা খেলতে খেলতে একসময় সকাল ফুরিয়ে যেত। সেই ফুরনো সকালের মুখে ওপরের রান্নাঘর থেকে শোনা যেত মিনামের গলা। সেই গলা বেজে উঠত জেঠুকে লক্ষ করে। বাজার হয়নি, রেশন তোলা হয়নি এই সব নি বেজে উঠতে না উঠতেই জেঠু বাগান ছেড়ে চলে যেত। এক আশ্চর্য ম্যাজিকওয়ালার মতো লুঙ্গি পরা খালি গা জেঠু বদলে যেত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জেঠুতে। তখন বাগানের বদলে তার সামনে এসে দাঁড়াত কলেজের ক্লাস ঘর। সে অবশ্য জেঠুকে কখনও কলেজের ক্লাস ঘরে দেখিনি।

অম্লানদাকে দেখেছিল। অম্লানদা জেঠুর কলেজে আগে পড়ত। এখন কলকাতায় পড়ে। টুনুদি গালে হলুদ মাখত। টুনুদির হাতের নখ বেশ বড়-বড় ছিল। সেই সব তীক্ষ্ণ নখে নেলপালিশ। ছাদের ঘর একানে নিঝুম। একটা খাট ছিল। একটা টেবিল আর চেয়ার। আর ছিল ঝুলন্ত এক জানলা। সেই জানলায় বাবু হয়ে বসতে পারত সে। সেই জানলায় বসে পাল্লা বন্ধ করে দিলে ঘরের সঙ্গে কোনও যোগ থাকত না, সামনে গ্রিলের ফ্রেম আর শূন্যতা। ফৌজদারকাকুদের বাগানের পেয়ারা আর নারকেল গাছ এই তিনতলার জানলার থেকে নিচু ছিল। দূরে মুখার্জিকাকুদের তিনতলা বাড়িটা শুধু এই জানলার মাথায় মাথায়। এই ঘরে হলুদ মেখে টুনুদি পড়তে বসত। টুনুদি শুধু মুখে হলুদ মাখত না হাতেও হলুদ মাখত। হাতে হলুদ মাখলে টুনুদি শাড়ি পরত না ম্যাক্সি পরত। হলুদ মেখে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যেত—কখন যেন অম্লানদা আসত। বোধহয় শনিবার। বোধহয় দুপুর বেলায়। বাগানের নালিগুলোয় তখন জল থাকত না। কুয়োতলায় দড়ি বালতি একা একা পড়ে থাকত। সে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ক্রু-ড্রাইভার মাঝের দরজায় গুঁজে জাহাজ চালাত। তারা একতলায় থাকত, মিনামরা দোতলায়। এই দুইতলার মাঝে একটা দরজা ছিল। সেই দরজা খুললে ওপরের তলায় যাওয়ার সামনের সিঁড়ি। সেই মাঝের দরজায় বসে সে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে জাহাজ চালাত। দুপুরে তার ওপরে যাওয়া নিষেধ ছিল। তবে সে অম্লানদার পায়ের শব্দ চিনত। সে জানে এ সময় সবাই ঘুমোয়। টুনুদি সিঁড়ি বেয়ে হলুদ মেখে তিনতলার ঘরে যায়। অম্লানদা ভালো ছাত্র—টুনুদিকে পড়া দেখাতে আসে। অম্লানদা প্রথমে সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় তারপর পিছনের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে যায়।

নন্দকাকুকে সে অবশ্য কোনোদিন রান্নাঘরের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে বা একতলার বাগানে নামতে দেখেনি। নন্দকাকু আসত জেঠুর কলেজে চলে যাওয়ার পর, অম্লানদা আসবার আগে। অম্লানদা অবশ্য রোজ আসত না। নন্দকাকু সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরত। বিড়ি খেত না। দাড়ি কামাত, মাঝে মাঝে। আধপাকা গুঁড়ো-গুঁড়ো দাড়িতে তার মুখ ভরে থাকত। তার হাতে থাকত দুটো বাজারের ব্যাগ। একটা মিনামের, একটা নন্দকাকুদের। মিনামদেরটা বড়ো, নন্দকাকুদেরটা ছোটো। নন্দকাকু একটু বেলার দিকে বাজারে যেত। তখন বাজারে বেগুন আর পটলের দাম কমে যেত। নন্দকাকু মিনামের রান্নাঘরের ওপরে ওঠার সিঁড়িতে দ্বিতীয় ধাপে বসে পড়ত। তার থেকে নিচেও নামত না, ওপরেও উঠত না। মিনাম তাকে নন্দবাবু বলে ডাকত। চা দিত, রুটি আর বেগুন ভাজা দিত। নন্দবাবু বেগুন খেতে খুব ভালো বাসতেন। বেগুনভাজার খোসা খেতেও তার আপত্তি ছিল না। নন্দকাকুকে মিনাম বাজার করে দিতে বলেনি, তবু নন্দকাকু করে দিতেন। নন্দকাকু জেঠুর সঙ্গে এক স্কুলে পড়ত। জেঠু বি. এ., এম. এ. পাশ করেছিল, নন্দকাকু করেনি। নন্দকাকু মিনামের রেশনও তুলে দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনামের রান্নাঘরের উনুনটা ছিল খুব বড়। পাতা উনুন, তার দুটো মুখ। তেমনি আঁচ। গনগন করত। একটায় ভাত চাপলে আর একটায় ডাল চাপত, একটায় মাছ চাপলে আর একটায় তরকারি চাপত। মিনাম বিকেলে উনুন তাতে যেত না। বিকেলে স্টোভে চা করত। রাতের রান্না তোলা থাকত জালের আলমারিতে। দুপুর রান্নার পর উনুন নিভে গেলে মঙ্গলাদি সে উনুন নিকিয়ে দিত। জেঠু মাঝে মাঝে কলেজ যেত না। একদিন বিকেলে মিনাম জেঠুর বুকের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক কালী ঠাকুরের ভঙ্গি। একটা পা একটু এগনো, জিভ বের করা। জেঠু কিছু বলেনি। সেদিন নন্দকাকুর জ্বর হয়েছিল। টুনুদি ছাদের ঘরে। সে বাইরে খেলতে যেতে পারেনি বলে ওপরে এসেছিল। তাকে দেখে জেঠুর বুকে দাঁড়ানো মিনাম কালীঠাকুর হয়ে গিয়েছিল না সে ঘরে ঢোকার আগেই মিনাম কালী ঠাকুর হয়েছিল তা বলার উপায় নেই। সে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেদিন বিকেলে স্টোভ জ্বেলে চা ছাড়াও মিনাম পাঁপড় ভাজা বানিয়েছিল। সেঁকা পাঁপড়ের থেকে ভাজা পাঁপড় খেতে তার ভালো লাগে। উনুনের ধিকি ধিকি আঁচে রুটি সেঁকার জালে খুব ভালো পাঁপড় সেঁকা যায়। স্টোভে পাঁপড় সেঁকলে কেরোসিনের গন্ধ হয়। ভাজা খেলে অবশ্য সে বিপত্তি হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিফোন

ছোটোবেলার প্রিয় খেলাদের কথা এখনও মনে পড়ে। প্রিয়তম ছিল নিজেকে নিজে ফোন করার খেলা। কানে রিসিভার দিয়ে বাড়ির ফোন নম্বর ডায়াল করি—৬৮৪। তখন পুরুলিয়া শহরে ওরকম ছিমছাম তিন সংখ্যার ফোন নম্বর ছিল। তবে ফোন করে কাউকে পাওয়া যেত না, আর নিজেকে-নিজে তো নয়ই। অন্যদের না পাওয়ার কারণ ব্যবস্থার গলদ। লাইন খারাপ—বাবা রোজই প্রায় বলত, 'টেলিফোনটা ডেড হয়ে গেছে। খবর দিতে হবে।' মৃতের ইংরেজি যে ডেড সেটা কেউ এভাবেই শেখা। একই যন্ত্রে আর একই নম্বরের সমবায়ে নিজেকে-নিজে ফোন করা যায় না বাবা বুঝিয়ে দিত সে কথাও। তোমার বাড়িতে যে টেলিফোনখানা রাখা সেই ৬৮৪ নম্বরওয়ালা যন্ত্র থেকে কেমন করে তুমি তোমাকে ফোন করবে বল! যে মুহূর্তে রিসিভার তুললে সে মুহূর্তেই লাইন এনগেজ। কাজেই নিজের ফোনে নিজের কাছে কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না তুমি। পারতে ফোনে নিজের গলা শুনতে, যদি এই বাড়িতেই পাশাপাশি রাখা থাকত দুটো আলাদা নম্বরওয়ালা টেলিফোন—ধরা যাক ৬৮৪ থেকে ফোন করলে ৬৮৫-এ। এক কানে তোমার ৬৮৪ আর অন্যকানে ৬৮৫। দুহাতে-দুকানে ধরে রেখেছ দুদুটো আলাদা রিসিভার। এক মুখের কথা দুকানে পৌঁছে যাচ্ছে দুই যন্ত্র মারফত। এক মুখের কথা অবশ্য কোনও দিনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটবেলার দুইকানে দুই যন্ত্র মাধ্যমে পৌঁছয়নি। সেই আগের শতাব্দীর আশির দশকে মধ্যবিত্ত বাড়িতে একটা ফোনই বিরল ছিল—কাজেই দুটোর প্রশ্ন ওঠে না।

দিন যায়। শতক বদলায়। নিজেকে নিজে টেলিফোন করার ইচ্ছে হারায়। বাবার শরীর ভাঙে—এসবই তো হওয়ার কথা। ডাক্তারবাবু বলেন, ক্রমশই বাবা এগিয়ে যাচ্ছেন সেই পথে যেখানে কোনওদিন টেলিফোন সংযোগ ছিল না।

বাবার পাশে নয়, কাজের চাপে নিত্য নানাখানে আমার আসা যাওয়া। সঙ্গে থাকে ছোট্ট কোলের কম্পিউটার। লিখি, পড়ি, গান শুনি, মেল করি, ছবি দেখি এই কোলযন্ত্রে। যন্ত্রবিশারদ বন্ধু বলে, লিখে যে সেভ করে রাখছ ফাইলের পর ফাইল যন্ত্র খারাপ হলে সব যে মুছে যাবে। খুঁজেও পাবে না আর সেই সব লেখা—এতো পাতা নয় যে হারানো পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেলে কোনও গোপন গৃহকোণে। ভয় হয়—নশ্বরতার কথা নিজের কথা ভাবি—বাবার দিকে তাকাই, মনে মনে।

ফিরছি একদিন। বাবারই কাছে। সুগম রেলপথ। কোলযন্ত্র খুলে বসি নিতান্ত আনমনে। ইন্টারনেটও সেদিন চলতি পথে সজীব। হঠাৎ খেলে ফেলি পুরনো সেই খেলা। একটু নতুন ভাবে। নিজেকে নিজে নিজের যন্ত্র থেকে মেল করা যায়। পাঠানো যায় নিজের যন্ত্র থেকে নিজেকে প্রিয় চিঠি। পরম আকুলতায় নিজেকে মেল করি নিজের প্রিয় লেখা। ফাইলের পর ফাইল সেভ নাম দিয়ে পাঠাই নিজের মেল অ্যাকাউন্টে। রইল। ওরা রইল। কোল যন্ত্রখানি যদি হঠাৎ খারাপ হয় তাহলেও রইল। যন্ত্রে নয় নিজের ভার্চুয়ালে নিজের প্রিয় লেখা সেভ করি।

এসব কারুকার্য বাবার অজানা। এখন আর নতুন করে বোঝানো যাবে না—সে উপায় নেই। বাবার চোখ হারিয়েছে সেই দ্যুতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলি না তাই, বাবা, মেল অ্যাকাউন্ট আমার ব্যক্তিগত জমি। আলিবাবার চিচিং ফাঁকের মতো কোনো পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি ঢুকতে পারি সেখানে। আমার নিজের যন্ত্র থেকে অশরীরী সে জমিতে জমাতে পারি নিজের কিছু লেখা। ততক্ষণই যতক্ষণ না সে জমিতে চোরাগোপ্তা হানায় ঢুকছে আর কেউ—কোনও হ্যাকার, যে নষ্ট করে ওই নিরাবয়ব পাতা।

বিদেশবাসী ডাক্তার বন্ধু বলে তোমার বাবার মেডিকেল রিপোর্ট মেল করো।

এভাবে আরও কিছুদিন কিছুকথা কিছুটা শরীর সেভ করা যাক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেফটিপিন

হরপ্পা সভ্যতায় জলনিকাশের সুব্যবস্থা ছিল, বাঙালির বাথরুমে অনেকদিন পর্যন্ত ছিল না। বন্যার জল সরে গেলে যেমন পড়ে থাকে পলি, পশু আর উদ্ভিদের মৃত দেহাবশেষ তেমনই মায়ের স্নান সারা হলে অনেকক্ষণ অবধি বাথরুমের অনুন্নত নালিপথে পড়ে থাকত সাবানের ফেনামাখা সাদা জল। আস্তে আস্তে সেই জল চলে গেলে থেকে যেত মা ধোওয়া সাবানের পলি আর কয়েকটা দীর্ঘ চুল। যা পড়ে থাকত না, ছড়িয়ে থাকত চানঘরে, তা রমণীয় গন্ধ—সকলের কাছে হয়তো রমণীয় নয়। নারকেল তেল, সাধারণ সাবান যা ধুয়ে দেয় রান্নার পর তেল হলুদ আর উনুনের আঁচমাখা মায়ের শরীর তা আর কত রমণীয় হতে পারে! তবু হলুদ চটা দেওয়াল, রোদ না ঢোকা বাথরুমের ৪০ ওয়াটের বাল্‌ব, শ্যাওলা পড়া বালতি, দেয়ালের পোয়াতি আরশোলাকে ভুলিয়ে দিতে পারত ওই গন্ধ। চৌবাচ্চা আর পার্টিশানের ওদিকে থাকা চিলতে ভারতীয় পাদানি বাদ দিলে খুব ছোটো ওই চানের জায়গা—যেখানে একটু আগে মা ছিল এখন নেই, তা কিছুক্ষণের জন্য হরপ্পার থেকেও ভালো বলে মনে হত।

ইতিহাসের বইতে রাখালদাসের হরপ্পার উন্নত স্নানাগারের ছবি আছে। অনেক মানুষ সেখানে স্নান করতে পারত। টিনটিনের বইতে আছে ক্যাপ্টেন হ্যাডকের বাথটবের ছবি। হ্যান্ড সাওয়ারকে হ্যাডক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

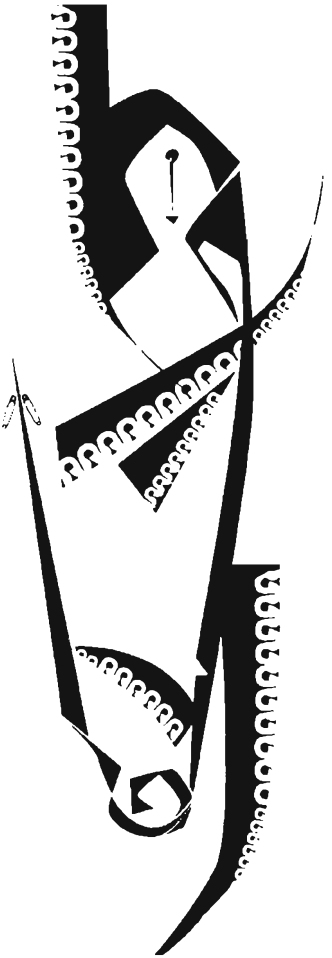

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন ভেবে কানে লাগাত। কিনু গোয়ালার গলি সিনেমায় বাঙালির অনুন্নত বাথরুমের ছবি পাওয়া যায় খানিকটা। তবে বাঙালি মধ্যবিত্ত আর ফিরবে না অমন নিকাশহীন বাথরুমে।

ক্রমশ সুরুচিময় সুরভিতে ভরে উঠছে বাঙালির বাথরুম। কিন্তু কী করব যদি মন খারাপ হয় ওই হারানো অনুন্নত বাথরুমের জন্য!

অনেক কিছুই তো হারায়—ফেলে আসতে হয়।

আমার মায়ের হাতে যে লোহার নোয়াখানি ছিল তাতে ঝুলতে দু-তিনটে সেফটিপিন। আমার জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে মা সেফটিপিন লাগিয়ে দিত। ব্লাউজের হুক ছিঁড়ে গেলে মায়ের ভরসা ছিল ওই সেফটিপিন—নিউলুক ব্রার হুক ছিঁড়ে গেলেও। মা রোজ ওই হারিয়ে যাওয়া বাথরুমে সেফটিপিন ফেলে চলে আসত। খোলা সেফটিপিন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্ডোম

ইন্টারনেটে ঢুকে দেখেছি কন্ডোম শব্দের উৎস নিয়ে নানা মতভেদ আছে। যে সাহেবরা আমাদের দেশে অনেকদিন রাজ করেছিল তাদের দেশের এক রাজার লোকায়ত নাম নাকি ছিল ড. কন্ডোম। যথারীতি মতভেদ। লাতিন condamina, যার মানে বাড়ি, কেউ কেউ বলে সেখান থেকেই নাকি নিষ্পন্ন হয়েছে কন্ডোম।

বাঙালির পূর্বপুরুষেরা কন্ডোম ব্যবহারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না হয়তো। ভাবতেন নর-নারীর মধ্যবর্তী এই আবরক শরীরী লীলায় উপদ্রব স্বরূপ। স্ফূর্তির মধ্যে অন্তরায় হিসেবে তা হয়ে উঠতে পারে অবদমনের উৎস। মধ্যবিত্ত বাঙালির বাড়িতে পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে কন্ডোমের থেকে কন্ট্রাসেপটিভ পিলই সেখানে বেশি ব্যবহৃত হত। বাঙালি পুরুষেরা খুব একটা কন্ডোম পরতে চায় না, অথবা পারে না। মেয়েরা ওষুধ খায়। যেমন Lyndiol.

ছোটোবেলায় আমরা একটা খেলা খেলতাম L-O-N-D-O-N–LONDON. একজন পিছন ফিরে সুর করে টেনে টেনে বলত L-O-N-D-O-N–LONDON. তার এই সুর করে বলার ফাঁকে বাকিরা পিছন থেকে তার দিকে ছুটে আসত। বলা শেষ হয়ে গেলেই যে যতটা ছুটে এল সেখানে থেমে গেল। তখন যে লন্ডন বলত সে এগিয়ে যেত তাদের দিকে। কথা বলে হাসানোর চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

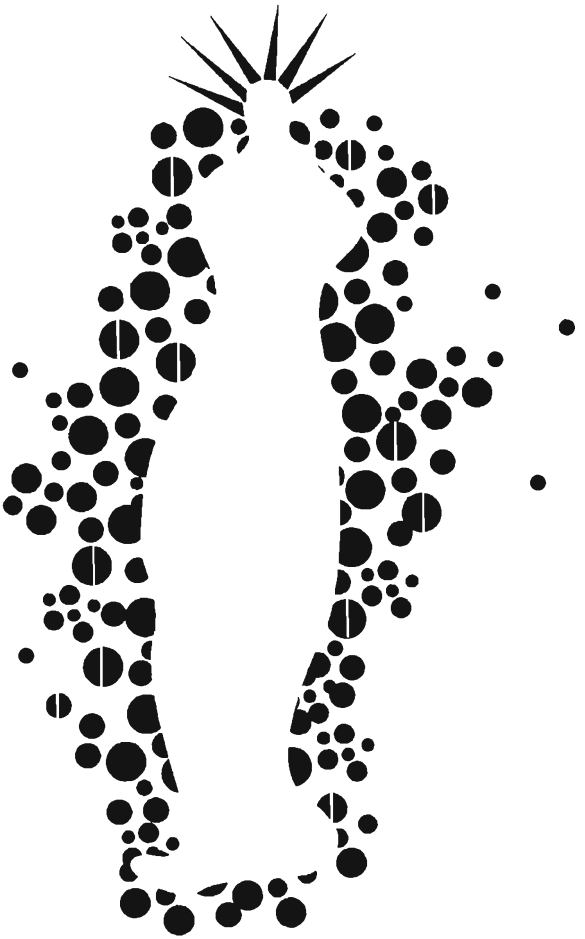

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত। থেমে থাকা নিথর খেলার সঙ্গীরা যদি এই প্রচেষ্টায় সামান্য সচল হত তাহলেই আউট। লন্ডন খেলাটা আসলে ছিল গো-স্ট্যাচু খেলার আরেকটা চেহারা। তার মনে হত একইভাবে সুর করে বলা যায় L-Y-N-D-I-O-L–LYNDIOL.

তাদের শোবার ঘরে যে দেওয়াল আলমারি ছিল তার মধ্যে রাখা থাকত লিন্ডিওল। মা রোজ রাতে লিন্ডিওল খেত। জ্বর নেই, সর্দি নেই, মাথা ব্যথা নেই, গা বমি নেই, তবু ওষুধ খেত মা। না খেলে বাবা মনে করিয়ে দিত। এমনকী একদিন সেও মাকে ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।

সন্ধেবেলা পড়তে চায়নি বলে মায়ের কাছে বকুনি খেয়েছিল। কাজেই ভাবে কোনও বড়ো কাজ করে মায়ের রাগ ভাঙাবে। ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া তার কাছে বড়ো কাজ বলে বিবেচিত হয়েছিল। মা সে কাজকে বড়ো বলে মনে করেছিল কিনা তা অবশ্য সে বুঝতে পারেনি। মায়ের আরেক রকম শরীর খারাপ হত, তখন মা সন্ধে জ্বালত না। বাবা, আর বাবা না থাকলে ওপরের বাড়িওয়ালা জেঠিমা সন্ধে জ্বেলে দিত। তখন মা লিন্ডিওলও খেত না। তাদের ছোট্ট ঠাকুরঘরের ঠাকুরেরা কি মায়ের লিন্ডিওল না খাওয়ার কথা জানত? মা যখন লিন্ডিওল খেত তখন রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিল—বিশ শতক, আশির দশক।

ইন্টারনেট জানাল, ১৯৬৭তে Basil A. Stoll *Effect on Lyndiol an Oral Contraceptive on Breast Cancer* নামে একটা গবেষণাপত্র লিখেছিলেন—লেখাটি ছেপেছিল বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল। স্টোল জানিয়েছেন লিন্ডিওল খেলে স্তন-ক্যান্সারের সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে যারা L-O-N-D-O-N–LONDON খেলত তাদের দেশের কথা আলাদা। সেখানকার ডাক্তারবাবু এস. কে. ব্যানার্জি জানিয়েছিলেন ভারতীয় মায়েদের জন্য লিন্ডিওল খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো—is an ideal OC; ১৯৭৩-এ Family Planning Welfare Centre of Medical College, Calcutta নিরক্ষর, জনবহুল ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে ওর‍্যাল কন্ট্রাসেপটিভের (OC) ব্যবহার নিয়ে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। তারাও লিন্ডিওলে কোনও বিপদ দেখেনি। এর আগে ১৯৭০-এ মিশরের আই. কামাল ও তার সহকারীরা লিন্ডিওল নিয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাতে শঙ্কা অনুচ্চারিত নয়, তবে অগৃহীত। ভারতীয় ডাক্তার ব্যানার্জিবাবুও তো একই ভাবে বলেছিলেন, minumum of side effects. বৃটেনে বর্জিত হলেই যে বাঙালি মায়েরা লিন্ডিওল খাবেন না তা কি হয়? প্রথম বিশ্বের শরীর আর তৃতীয় বিশ্বের শরীর আলাদা। কাজেই আশির দশকের ভারত—এশিয়াড গেমস, রাকেশ শর্মা, লিন্ডিওল।

প্রথম বিশ্ব আর তৃতীয় বিশ্বের শরীর আলাদা হতে পারে, তবে তৃতীয় বিশ্বের কেউ তার সামর্থ্যতাবলে প্রথম বিশ্বে কি যেতে পারে না! পারে। নব্বই এর দশকে এই যাওয়ার পালে হাওয়া লাগে। পাল বেয়ে নয় বাংলাদেশের কম ভাড়ার বিমানে ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিল তার দাদা।

তাদের বাড়ি থেকে লিন্ডিওল একসময় চলে যায়। আর ফিরে আসেনি। এসে ঢুকেছিল কন্ডোম। তার মায়ের সাধ ছিল পাকা চুলে সিঁদুর দিয়ে ছেলে বউ নাতি নাতনি নিয়ে ঘর আলো করে সংসার করবে। সে সাধ পূর্ণ হয়নি। নব্বই দশক থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে যেখানে খানিক পড়াশোনার চল আছে সেখানে এ স্বপ্ন ফলার কারণ নেই। এখানেও ফলেনি। পড়াশোনা করলে ছেলে তো কাজে বা উচ্চশিক্ষার জন্য ঘর ছাড়বেই।

কিন্তু লন্ডন খেলা আর লন্ডন চলে যাওয়া তো এক জিনিস না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর না হয় ছাড়ল, তারপর নিজের ইচ্ছেয় প্রেমজ বিবাহ! মায়ের অধিকারবোধ বার্লিনের পাঁচিলের মতো ভাঙে। বছরে একবার দেশে ফেরার সময় নানা অজানা নিত্য ব্যবহার্য বিদেশি জিনিস মায়ের জন্য আনা।

সেগুলোর প্রতি টান। পূব-পশ্চিমের দিকে অবাক হয়ে চায়—কাছে টানে। তবু দূরের হয়ে গেছে ছেলে—ছেলে তো এখন বউয়ের। ছেলে আর বউ বাইরে গেলে দুপুরবেলা ছেলের ঘরে ঢোকে মা। ছমছমে শীতের দুপুর। এই ঘরে সচরাচর ঢোকা হয় না এখন—দ্বিধা। আবার কৌতূহলও আছে। এটা সেটা নিয়ে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা। এটা কী? দাঁতমাজার ব্যাটারিচালিত ব্রাশ। ওটা? সেভিং ফোম। ওইটা? নরম। শীতল। প্যাকেটবন্দী। চকিতে কেঁপে উঠে ঘর ছেড়ে চলে যায় মা।

জীবনে প্রথম বিবাহিত ছেলের ঘরে তাদের অনুপস্থিতিতে কন্ডোম দেখল মা। অথচ পিলের থেকে কন্ডোমের ইতিহাস প্রাচীন। ১৬৬৬ তে English Birth-rate Commission, Condons নামক নিরোধকের কথা তাঁদের রিপোর্টে লেখে ব্যবহারও করতে বলে। কন্ট্রাসেপটিভ পিল তো ষাটের দশকের মার্কিন সম্ভার।

অনেক সময় পুরনো জিনিস আমাদের দেখা হয়ে ওঠে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথা থেকে ফিরে যাবি
সে তো তুই ঠিক করবি
দরজার ভেতর থেকেও হতে পারে
আবার বাইরে থেকেও।

আমি দাঁড়িয়ে থাকব ঠিক দরজায়,
যত দিন যাবে তত দরজা দরজা হয়ে উঠবে
আমার হাত পা মাথা।

হাওয়ায় হাওয়ায়
হাট করে হা হা করে খুলে খুলে যাব।

দরজার গরাদ থাকে না
জানলার মতো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. গুপ্ত

মধুসূদন গুপ্ত কীভাবে কলকাতা যেতেন? গোপাল মজুমদার যেভাবে কলকাতা যেতেন কবিরাজ মধুসূদন গুপ্ত সেভাবে কলকাতা যেতেন না। গোপাল মজুমদার বৈদ্যপাড়া, বৈদ্যবাটী থেকে পায়ে হেঁটে শেওড়াফুলি স্টেশনে যেতেন। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতা। সেই ট্রেন অবশ্য এখনকার মতো তড়িৎচালিত লোকাল ট্রেন ছিল না—কয়লার ইঞ্জিনটানা রেলগাড়িতে কলকাতা যেতে এখনকার থেকে অনেক বেশি সময় লাগত। গোপাল মজুমদারের সময় তৈরি হলেও, মধুসূদন গুপ্তের সময় রেলপথ সরব ও সচল হয়নি।

মধুসূদন গুপ্ত নেই তবে যে বাড়িতে থাকতেন তিনি সেই বসতবাটীটি এখনও আছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে মধুসূদন গুপ্তের বাড়ির পিছনে একটি মজা খাল আছে। খালটি একদা সুবাহী ছিল। গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। নাব্যতাও ছিল তার। মধুসূদন কি ওই খালপথে কলকাতা যেতেন? অন্তত তাই ভাবতে ইচ্ছে করে।

ইংরেজ আমলে সাহস করে কুসংস্কার ডিঙিয়ে শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন মধুসূদন। কেউ মরে গেলে দাহ করা নিয়ে নানা সংস্কার ছিল তখন। বৈদ্যবাটী অঞ্চলে সতীদাহ নিয়ে নানা ঘটা-পটা ছিল। এমন একটা সময় শবব্যবচ্ছেদ বড় সহজ কথা না। মধুসূদন ছিলেন ইয়াংবেঙ্গলদের অন্যতম রসিককৃষ্ণের ছাত্র। ধরে নেওয়া যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

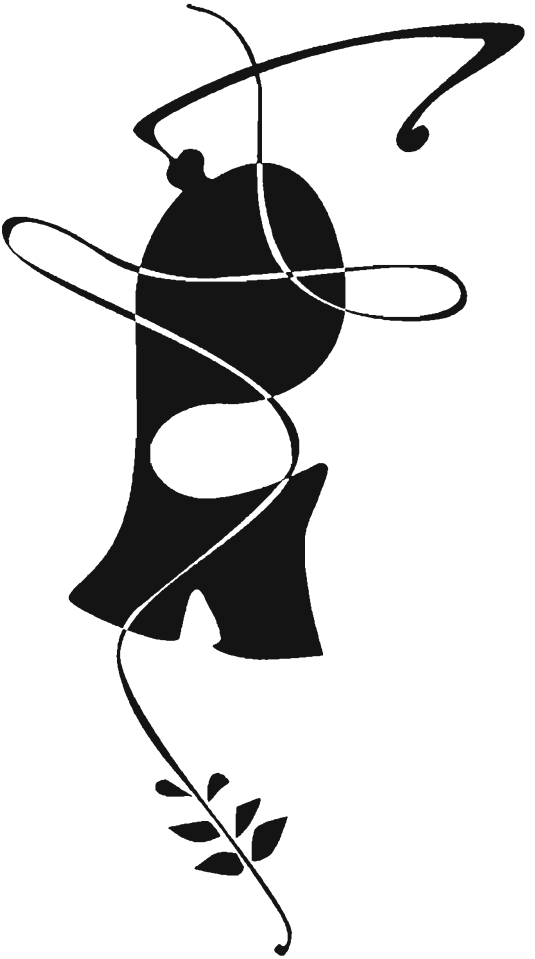

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিরোজিওর সরাসরি ছাত্র না হলেও কুসংস্কার অতিক্রমের পূর্ববর্তী এই প্রয়াস তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কাজেই সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসা শাস্ত্রের এই অধ্যাপক ১৮৩৬-এ নিজের হাতে শব্যবচ্ছেদ করেন—মোমের মডেলের দিন গেল।

ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে তিনদিন ধরে টাউন হলে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি বিবৃতি দেন। আচ্ছা মধুসূদন কি বৈদ্যবাটীর বাড়ি থেকে কলকাতায় গিয়ে বিবৃতি দিতেন? না কি কলকাতায় গিয়ে থাকতেন? ভাবতে ভালো লাগে তাঁর বাড়ির ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকত। গুপ্তমশাই সেই নৌকায় উঠলেন, নৌকা চলল কলকাতা।

গোপাল মজুমদারও মধুসূদনের মতো বৈদ্যপাড়ায় থাকতেন। তবে মজুমদারদের সঙ্গে গুপ্তদের প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা ছিল না। গোপাল মজুমদার জন্মেছিলেন মধুসূদনের পরের শতকে। গোপাল মজুমদারের পাঁচমেয়ের মধ্যে দ্বিতীয়জন মধুসূদন গুপ্তের বংশের এক মেয়ের—ঝুন্টিপিসি যার নাম—পাঠশালায় পড়ত। পাঠশালাটি মধুসূদনের বাড়িতেই বসাতেন ঝুন্টিপিসি। মেয়েদের মনের অন্ধকার ব্যবচ্ছেদের কাজে নেমেছেন মধুসূদনের পরিবারের এক মেয়ে।

গোপাল মজুমদারের তিন নম্বর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মথুরেশচন্দ্র রায়ের ছোটোছেলের। ছোটোছেলে বলা হল বটে তবে হিসেবটা অত সহজ নয়। গোপাল মজুমদার রেলে চাকরি করতেন। ছবি আঁকতেন চমৎকার। একটা মডেল স্টেশন বানিয়ে ছিলেন। দিল্লির প্রদর্শনীতে সেটা পুরস্কার পায়। সে খবর আসে গোপাল মজুমদার মারা যাওয়ার পর। হ্যাঁ গোপাল মজুমদার অকালে মারা গিয়েছিলেন— অ্যাক্সিডেন্ট। ছবি আঁকছিলেন এক বিকেলবেলায়। আলো কমে আসছিল বলে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালতে গিয়েছিলেন। তড়িতাহত। বাবা মারা যাওয়ায় পাঁচবোনের বিয়ে মেটানোর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়-দায়িত্ব পড়ল বাড়ির অন্যান্য অধিকর্তাদের ওপর। পাঁচমেয়ের বিয়ে হয়—একে একে। সবারই গোপাল মজুমদারের মৃত্যুর পর। তিন নম্বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মথুরেশচন্দ্রের ছোটোছেলের। মথুরেশচন্দ্রও রেলকর্মী। তার খান দশ-বারো ছেলে-মেয়ের মধ্যে দুজন বেঁচে ছিল। একজন বিয়ে করেনি—দুজনের মধ্যে যে ছোটো সে মৃত গোপাল মজুমদারের তিন নম্বর মেয়েকে বিয়ে করে।

পারিবারিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায় গোপাল মজুমদারের তিন নম্বর মেয়ে সুখী হয়নি। নানা কারণ। একটা কারণ কুষ্ঠ। মথুরেশচন্দ্রের পরিণত বয়েসে কুষ্ঠ হয়—মথুরেশচন্দ্রের অবিবাহিত বড়োছেলেরও কুষ্ঠ হয়েছিল।

গোপালচন্দ্রের তিন নম্বর মেয়ের ধারণা ছিল কুষ্ঠ যৌন স্বেচ্ছাচারের ফল। তার এমন ধারণার ভিত্তি কী? টাউন হলে মধুসূদন যে বিবৃতি দেন তাতে তিনিও কুষ্ঠকে যৌনব্যাধি বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই বিবৃতি গোপাল মজুমদারের তিন নম্বর মেয়ের শোনার ও জানার উপায় ছিল না। এখন চিকিৎসাবিজ্ঞান মধুসূদনের এই কথাকে মানে না। তাতে কী? মানুষ মরে গেলেও তার ভাবনা আকাশে বাতাসে থেকে যায়। বৈদ্যপাড়া বৈদ্যবাটীতে থেকে গিয়েছিল। গোপাল মজুমদারের মেয়ে সেখান থেকে সেই বাতাস বয়ে এনেছিল।

ভাশুর আর শ্বশুর সম্বন্ধে তার অশ্রদ্ধার একটা কারণ মধুসূদন গুপ্ত। মধুসূদন সব কারণ নয়। পারিবারিক সাক্ষ্য থেকে এও জানা যায় গোপাল মজুমদারের মেয়েকে মাঝে মাঝে মথুরেশচন্দ্রের পায়ে তেল মালিশ করতে হত। কোনও এক মালিশকালে নাকি মথুরেশচন্দ্র উরুর ঊর্ধ্বদেশ মালিশ করতে বলে।

গোপাল মজুমদারের মেয়ে, মথুরেশচন্দ্র মারা যাওয়ার ঢের দিন পর এ অভিযোগ করে। ফলে কয়েকটা কথা ভাবার। এ অভিযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য হতেও পারে, কারণ এত দিন পর মৃত শ্বশুর সম্বন্ধে বাজে কথা বলে কী লাভ? আর বাঙালি পারিবারিক পুরুষেরা তো নানা চাতুরিতে অন্যান্য ভারতীয় পুরুষদের মতো স্পর্শসুখ অনুভব করতেন। এ সব চাপা থাকত। অন্য একটা দিকও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বাস্তবকে তো অনেক সময় আমরা মন দিয়ে ঘটিয়ে তুলি। কুষ্ঠ চরিত্রহীনতার লক্ষণ মনে হয়েছিল যার সে কি মথুরেশচন্দ্রের পদসেবাকালে কোনও সরল ইঙ্গিতকে জটিল ভাবে ভেবেছিল! মনের গতিতে ঘটনা অন্য চেহারা পায়! তবে পায়ে তেল মালিশ করানও যথেষ্ট লিঙ্গতান্ত্রিক কাজ।

যত দিন যাচ্ছে তত মজে যাচ্ছে বৈদ্যবাটীর গঙ্গা। মধুসূদনের প্রপিতামহ কালীচরণ গুপ্ত নবাব সরকারের কাছ থেকে বকসি খেতাব পান। মধুসূদন সে খেতাব ব্যবহার না করলেও মধুসূদনের বাড়িটি বকসি-বাড়ি বলে পরিচিত। পেছনের মজা খালটায় আজকাল বড্ড মশা হয়। একটা শিউলিফুলের গাছও আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাফপ্যান্ট

বাইরের নয় ঘরের, সদরের নয় অন্দরের কথাই ছোটোছেলেদের কানে বেশি করে ভেসে ভেসে আসে। ছেলেরা পুরুষ হয়ে গেলে সে কথা আর আসে না। কারণ পুরুষেরা, সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরুষ, তো এখনও ঘরের প্রতিপক্ষ। তাদের কি সব কথা বলা চলে! পুরুষেরা এই অন্দরের ছেলেবেলার কথা সহজে ভুলে যায়। এই হারানো অন্দরবেলা নিয়ে কোনও একদা ছোট্যাওটা পুরুষেরও দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। তবে কখনও কখনও এই অন্দরবেলার একটা দুটো কথা হঠাৎ ঝলসে ওঠে। কেন কীভাবে বলা মুশকিল।

যেমন সেই জটলার কথা।

এ বাড়ির সদর ও বৈঠকখানা ঘর অনেকদিন হল বন্ধ। যাতায়াতের জন্য খোলা পিছনের গলির দরজা। সরু গলি। মানুষের জন্য নয়, খাটা পায়খানার ডাবার জন্য একদা বরাদ্দ ছিল এই গলিপথ। সেই ডাবা অবশ্য নিজে নিজে যেতে পারত না—মানুষবাহিত হয়েই যেত। খাটা পায়খানা এখন অব্যবহৃত স্মৃতি। ডাবা নির্গমনের খোলা মুখ সিমেন্ট ও ইঁট দিয়ে ঢাকা হয়েছে। সেই ডাবাবাহী মানুষটির উত্তরপুরুষ ডাবার মতো চলে যায়নি কোনও ঘেরাটোপের পিছনে—পুরসভার কাজে বহাল করেছে নিজেকে। বংশগতির দাবিতে। আর রয়ে গেছে গলিপথ। ডাবার নির্গমনমুখ আবৃত হতেই সকলের গমনাগমনের পথ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠল সে গলি। এমনকী নিতান্ত শৈশববদ্ধ এক হাফপ্যান্ট উত্তরপুরুষের কাছে এই গলিটি রহস্যের মর্যাদাও লাভ করে। পড়ে থাকা পাতায় ছাওয়া গলিপথ—পা ফেললে মচমচ শব্দ হয়। সূর্য কখনও ঢোকে না। ছায়া ঘন গলির মুখে কিছু একটা ঢাকা। সেটা কী জানে না হাফপ্যান্ট। কাজেই সবমিলিয়ে যথেষ্ট নির্জনতা ও রহস্যময়তা লাভ করে গলি, অন্তত হাফপ্যান্টের কাছে।

শুধু গলি নয়, হাফপ্যান্ট, হাওয়াই চটি আর খড়ি ওঠা পায়ের কাছে রহস্যের কী শেষ আছে? একটা মেটে তো আর একটা তৈরি হয়। কেন বৈঠকখানা আর সদর বাদ দিয়ে যাতায়াত করা হয় গলিপথে তা জানা গেল দিদিমার কাছে। অকালমৃত দাদু সদরপথে শ্মশান গিয়েছিলেন—তারপর থেকে ওই অপয়া সদরপথ দিয়ে যেতে কেমন একটা বেদনা হত সবার। তবু যেতে হত, উপায় ছিল না। তারপর একদিন যখন উপায় হল, তখন বর্জিত হল সেই সদরপথ। পুরসভা খাটা পায়খানার ব্যবহার বন্ধ করার জন্য পুরবাসীদের কাছে আবেদন জানায়।

মানুষী বর্জ্য বহনের দায়বাহী গলিপথে চলাচলকারীরা আর চাইছিল না এই কাজ করতে। বর্জ্য কোথায় ফেলা হবে আর কারা ফেলবে—সে সমস্যা তো বঙ্গদেশে নতুন নয়। বড় মানুষেরাও এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কলকাতা কর্পোরেশনের ফাইল ওল্টালে তা টের পাওয়া যাবে। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৮ এর নভেম্বর মাসে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে *Two of our Problems* নামে ছোট একটা লেখা লেখেন। রাস্তা আর বর্জ্য ছিল সেই লেখার বিষয়। সুভাষচন্দ্র নাগপুরের উদাহরণ টেনে লিখেছিলেন কলকাতার বর্জ্য ধাপায় ফেলা উচিত। সেই মানুষী বর্জ্য চাষের কাজে লাগানো যেতে পারে। ...there are reservoirs where the solid and semi-solid substances in the sewage settle down. From

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

these reservoirs, the effluent escapes into the farm and irrigates it. কিন্তু সব জায়গায় তো আর কলকাতার মতো ধাপা ছিল না। তাছাড়া গৃহবাসী মানুষের শারীরিক বর্জ্য যদি গৃহ তলদেশের মাটিতে মিশে যায় তাহলে সমস্যা সহজতর হয়। খাটা পায়খানা যা পারে না, উন্নততর প্রণালী তা পারে—ঢাকা অন্তরালবর্তী এই পদ্ধতি মানুষী বর্জ্যকে পঞ্চভূতে লীন করে দেয়। কাজেই বর্জ্য-নিয়ন্ত্রণের উন্নতি বঙ্গদেশকে সভ্যতর করে তোলে।

এই সভ্য ব্যবস্থায় খাটা পায়খানার ডাবামুখ ঢাকা পড়ল, গলিই হয়ে উঠল যাত্রাপথ। সদর বন্ধ হল।

হাফপ্যান্ট সেই সদরকে আবার একদিন খুলতে দেখল। তার এক মাসতুতো দিদির বিয়ে ঘনাল। পড়াশোনা খুব একটা করেনি সেই দিদি। তাই তাড়াতাড়ি ডবডবে লাবণ্য থাকতে থাকতেই তার বিয়ের ব্যবস্থা করে গুরুজনেরা। সামাজিক বিয়ে তো আর গলিপথে হতে পারে না। তার আয়োজন ও প্রয়োজনের জন্য সদরের দরকার। তাই আবার খুলল সদর—গলিপথও বন্ধ হল না।

এবার বেশ মজা হল। একই বাড়ির দুটো প্রবেশপথ, দুটোই খোলা। যেটা দিয়ে ইচ্ছে সেটা দিয়েই ঢোকা যায়। বিয়ে বিষাদকে বোধহয় ভুলিয়ে দেয়। যারা মৃতের যাত্রাকে ভুলতে না পেরে সুবিধেমতো সেই যাত্রাপথকে বন্ধ করে গলিকেই সদর করে নিয়েছিল, তারা আবার আসন্ন উৎসবে সদরগামী হয়ে উঠল। এই উৎসবের দিনগুলিতে হাফপ্যান্ট একবার সদর দিয়ে ঢোকে তো একবার গলি দিয়ে।

মাসতুতো দিদির ডবডবে অবস্থাতেই বিয়ে দিল বিচক্ষণ অধিকর্তারা। সত্যিই তা বিচক্ষণতা হয়েছে কি না বা হলে কতটা হয়েছে তা জানার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল বাড়ির মেয়েমহল। আটদিনের মাথায় বাপের বাড়ি এল মেয়ে। দিদিমা, মা, মাসিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জটলা—গল্প। দিনভোর। এই গল্পে হাফপ্যান্টের থাকার কথা নয়। সে ছিল না। হঠাৎই ঢুকে পড়েছিল।

দুপুরবেলা মা ওবাড়ি চলে যাওয়ার পর তার একাএকা খারাপ লাগতে থাকে। বাবা অফিস গিয়েছিল। সেদিন কোনও একটা কারণে হাফপ্যান্টের স্কুল বন্ধ ছিল। এঘর ওঘর করতে করতে ঠিক করে সেও ওবাড়ি যাবে। বড়দের মতো বাড়ির দরজায় তালা লাগায়। চাবি পকেটে ঢোকায়। তারপর দিদিমা আর মাসিদের বাড়ি পায়ে পায়ে হাজির হয় সে।

স্বাধীনতার পতাকা তোলার জন্য যে বেদী তার পাশেই সদর দরজা। সে দরজা লাগানো ছিল, গলিপথ খোলা। সে গলির দরজা ঠেলে চুপিচুপি ঢুকে পড়ে। মা অবাক হয়ে যাবে, তাকে দেখে।

গলির দরজা খুললেই উঠোন। উঠোনের একপাশে কুয়ো। কুয়োর সঙ্গে টিউবওয়েল লাগানো। উঠোনতলার পাশে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। আস্তে আস্তে পা টিপেটিপে ওপরে ওঠে সে। মাকে চমকে দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। পুরনো বাড়ির সিঁড়ি—সরু ও একটার থেকে আর একটার দূরত্ব যথেষ্ট। তবু সে নিঃশব্দে ডিঙিয়ে যায় পথ। সিঁড়ির ডানদিকের দেওয়ালে দুটো বন্ধ জানালার চিহ্ন। শুনেছে সে, পাশের বাড়িটি পুরসভার নিয়ম না মেনে দুই বাড়ির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবধান না রেখেই গড়ে তোলা হয়েছিল। শুধু তাই নয় পাশের বাড়ির ওই বেনিয়ম এতটাই মাথা তোলে যে দু দুটো জানলা এ বাড়ির সিঁড়ির দিকে ফোটানো হয়। তখনও অকালমৃত্যু এ বাড়িতে ঢোকেনি। কাজেই বেনিয়মের জানলাদুটোর প্রতি প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। বাড়ির মেয়েদের সম্মান বিপন্নকারী জানলাদুটো সিমেন্ট আর ইঁট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দিতে হয়—ঠিক এভাবেই তো অনেক পরে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল খাটা পায়খানার ডাবানির্গমনের অব্যবহৃত পথ। বহনকারীদের প্রতিবাদ আর সম্মানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নও যুক্ত ছিল তার সঙ্গে।

সিঁড়ি শেষ হতেই হাফপ্যান্ট, মা-মাসি-দিদি-দিদিমার সহাস্য অথচ নিচু গলার জটলার মুখোমুখি হয়। এতটাই নিমগ্ন ছিল তারা জটলায়, যে তাকে কেউ খেয়ালও করে না। কী বলছিল তারা!

কীরে!

একদিনও ছোঁয়নি তোকে!

অসুস্থ না কি?

হাত পাগুলো কেমন ছোট ছোট!

ওইটাও ছোট।

দুপুরবেলা মেশানো বিকেলে পাক খায় হাওয়া। জটলায় হাসি ওঠে। হাফপ্যান্টকে কেউ লক্ষ করে না বলে চলে যেতে ইচ্ছে করে তার। অথচ অলক্ষ্য কথার টানে যেতেও পারে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর

আমার বাবা ফ্রয়েডের নাম শুনলেও শুনতে পারেন, লেখা যে পড়েননি তা নিশ্চিত। বাবা মায়ের বিয়েতে পাওয়া অনেক কিছুই আমরা ব্যবহার করতাম—খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল। ব্যবহার করতামও না অনেক কিছু—রুম হিটার, ইস্ত্রি, সমরেশ বসুর বিবর। রুম হিটার আর ইস্ত্রি অব্যবহারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিবর মুখ লুকিয়েছিল দেব সাহিত্য কুটীরের তলায়। বাবা মায়ের বিয়ের বছর ১৯৬৮। বিবরের প্রকাশ বছর ১৯৬৬। ওদের প্রথম ছেলের জন্ম ১৯৬৯।

আমার দাদা, বাবা মায়ের প্রথম ছেলে, ছোটোবেলায় কখনও বাবাকে আদর করেছিল কি না আমি জানি না। জানার কথা নয়—জন্মের আগের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় না। অপরের কথা থেকে অনুমান করা যায় মাত্র। স্মৃতিই সেইসব শব্দকথার উৎসমুখ। স্মৃতি স্মৃতিকথা না হলে অবশ্য তা শোনার উপায় নেই। বাঙালিরা যত কবিতা লেখে, তত স্মৃতিকথা লেখে না। আমার দাদা কবিতাও লেখে না, স্মৃতিকথাও না। কাজেই দাদা, বাবার সঙ্গে শৈশবে কখনও আদর আদর খেলেছে কি না সে সম্বন্ধে কোনও শব্দপ্রমাণ হাজির করা সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অর্থাৎ সে। সে তার মায়ের সঙ্গে ছোটোবেলায় খুব আদর-আদর খেলত। বিশেষ করে শীতকালে। ঘন শীত পড়ত তখন। সকালবেলার হাই ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে আসত মুখ থেকে। মুখের উষ্ণতা আর ঘর-বারান্দার শীতলতা দুয়ের সম্পর্ক ছিল এতটাই বিষম যে সকালের গরম হাই ধোঁয়া হতে সময় লাগত।

রাতে মায়ের পাশে শুয়ে লেপের মধ্যে সে গড়ে তুলত নিজস্ব এক গুহা। মুখ পর্যন্ত লেপে ঢেকে উধাও হয়ে ডুবে থাকত সেই গুহাঘরে। মাঝে মাঝে মুখ বের করে দেখে নিত তার চারপাশ। মা রান্নাঘর গুছিয়ে শুতে আসত এক সময়ে তখন মাকে ঘিরে তার জগৎ—আদর করার, আদর খাওয়ার। এ খেলাটা সে তার মিতবাক বাবার সঙ্গে কখনও খেলেনি। বালিশের পাশে টর্চ আর ঘড়ি রেখে শুয়ে পড়ত নিয়মিত মর্নিং ওয়াকে কুশল বাবা—সেও একসময় সেঁধিয়ে যেত ঘুমে।

শীতে বাবা ক্রিম মাখত না। বাবার খুব পা ফাটত। শীতে বাবা ক্রিকেট খেলা দেখতে পেত না, রেডিওতে সারাদিন খেলা শুনত। শীতে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হত। বৃষ্টি ডেকে আনত আরও শীতকে। তখন সকালের হাই আরও তাড়াতাড়ি ধোঁয়া হয়ে যেত। বাবা বলত, আসলে হাই ধোঁয়া হয় না—বাইরের শীতল জলকণা মুখের ভেতরের গরমের ছোঁয়ায় মুহূর্তমধ্যে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। বাবার সায়েন্স ছিল—মায়ের আর্টস। বাবা বুঝিয়ে দিলেও হাইকেই ধোঁয়া বলে ভাবতে ভালো লাগত তার। ঠিকের থেকে ভুলকেই ঠিক বলে মাঝে মাঝে ভাবতে ভালো লাগে।

শীতের বিছানায় বাবা তার বাঁদিকে শুত, মা শুত ডানদিকে। বাবার দিকের দেওয়ালের ছিল নীল রাত আলো, মায়ের দিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ালে ছিল ক্যালেন্ডারের রামকৃষ্ণ। মাকে ঘিরেই তার জগৎ ছিল বলে সে শুত ডানকাতে। খুব এক শীতের রাতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ মাত্র একদিন সে বাঁকাত হয়ে যায়। বাবাকে খুব খুব আদর করে।

ডান আর বাঁ ভুল হয়ে গিয়েছিল তার—ভুলকেই কি ঠিক বলে ভেবে নিয়েছিল বাবা!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্র চশমা

সমুদ্রের বয়স কমেনি, বাঙালি শিশু ও নারীদের সমুদ্রের কাছে যাওয়ার বয়স কমেছে। আমার মা প্রথম সমুদ্র দেখেন বাবার চাকরির শেষ বছর—অবসরের পর অফিসের হলিডে-হোম আর পাওয়া যাবে কি না এই সংশয় থেকে। পুরী যাওয়া হয় সেবার পুজোয়। মায়ের পুণ্যে ছায়ের পুণ্য। সুতরাং ছেলে পুরীর সমুদ্র দেখল প্রায় যৌবনে—ক্লাস ইলেভেন কি প্রান্ত কৈশোর না কি প্রায় যৌবন! কে জানে?

হয়তো সমুদ্র দেখার পক্ষে ওই পরিবারটিতে মা আর ছায়ের বয়স একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল নানা কারণে। মায়ের ভাষায়, তার চিরকেলে বুড়ো বাবার শখ-সাধ-আহ্লাদ না থাকায় সমুদ্র থেকে অনেকদিন অনেক দূরে ছিল তারা। বাবা একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিল, করবে না করবে না করে। আর তার মায়ের বাবা অকালে মারা গিয়েছিলেন বলে, দিদিমা পাঁচ মেয়েকে নিয়ে অকালে বিধবা হয়েছিল বলে, বুড়ো বরেই তার মায়ের এই বিয়ে দেন পারিবারিক অধিকর্তারা।

শখ-সাধ-আহ্লাদ না-থাকা জন্মবুড়ো বাবা অবশ্য চাকরির শেষ বছরে যথেষ্ট সমুদ্র স্নান করেছিল। প্রায় যৌবনে পৌঁছে যাওয়া ছেলেটির মনে হয় বৃদ্ধ কত বলিষ্ঠ হতে পারে সমুদ্র না দেখলে সে বুঝতেই পারত না। একটানা ঢেউ, ওঠে আর ভাঙে। দূর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেনামাখা ঢেউ সামনে এগোয়। এই জলের মধ্যে কি নেই পৃথিবীর আদিম জলের স্মৃতি আর দাগ! সেই আদিম বুড়ো জল এখনও কী প্রবল সংরাগ দেখাতে পারে স্নানে নামলে বোঝা যায়। তার মা অবশ্য জলভয়ে একদিনও নামেনি সমুদ্রে।

হলিডে হোমে রান্নার ব্যবস্থা ছিল। মাছ ভাত, মাংস ভাত রান্না হত হলিডে হোমের স্টোভে। সমুদ্রস্নানের পর মায়ের রান্না করা খাবার বড়ো ভালো লাগত তাদের। বাড়ির থেকে এই বাইরে এসে অনেকটাই বেশি খেত তারা। হোটেলে যে খাওয়া যেত না তা নয়। তবে রান্না করে খেলে খানিকটা সাশ্রয় হত। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর একটা বাড়ি বানানোর কথা প্রতিডেন্টফান্ড আর গ্র্যাচুয়িটির টাকায়। জমি কেনা পড়ে আছে। হোটেলে কি এখন ভাত খাওয়া চলে! দুটো টাকাও তো বাঁচালে বাঁচে।

সমুদ্রের ধারে গিয়ে মা চান করেনি, রান্না করেছিল। সে কি শুধু সাশ্রয় হবে বলে, না কি চেনা অভ্যেসের বাইরে যাওয়ার মন হারিয়ে গিয়েছিল তার! মায়ের কথার মধ্যে অনেক খাবার আর রান্নার শব্দ—বাবা নাকি ফুলশয্যার পরদিন সকালবেলায় বাসি মুখে মাকে এঁটো চা অফার করে। ম্যাগো বাসি মুখে কেউ চা খায়! তাও এঁটো। বাবা নাকি মাকে ভোর চারটের সময় খুড়তুতো দেওরদের জন্য রান্না করতে হবে বলে ঘুম থেকে তুলে দিত। একঘন্টার চেষ্টায় উনুন ধরাত মা। খেয়ে টিফিন নিয়ে দেওরেরা কারখানার মর্নিং শিফটের ডিউটি করতে যেত। মায়ের খুড়শাশুড়ি নাকি একাদশীর দিন এলাহি লুচি খেত। তার বাবা নাকি কোনও দিন মায়ের রান্নার প্রশংসা করেনি। এই সব খাবার আর রান্নার শব্দ সমুদ্রের ধারে গিয়েও মায়ের পিছু ছাড়েনি—মায়ের অনিচ্ছাকে ঢেকে দিয়েছিল মায়ের নিরুপায় ইচ্ছা। তবে মায়ের সমুদ্রস্নানের অনিচ্ছাকে বাবা কোনও নিরুপায় ইচ্ছার দাপটে ঢেকে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেনি, হয়তো চায়নি।

বৃদ্ধ বলিষ্ঠ সমুদ্র অবশ্য স্নানযাত্রীদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা কানেও তোলে না। একবার জলে নামলে তুমি চাও বা না চাও ঢেউ সে মাখাবেই। অসচেতন হলে বেসামাল করতে ছাড়বে না। এই স্নানে সেই কর্তা। নদীতে চলে, বৃদ্ধ সমুদ্রের বুকে সাঁতার চলে না। বড়জোর ভাসতে পার নুলিয়ার টায়ারে—কিছুটা কিছুক্ষণ। সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে যদি মেলাতে পার তাল, যদি সেই ছন্দে ভাসতে আর লাফাতে পার তবে স্নান মনোরম হবে। না হলে নয়।

মা বলেছিল, 'কী আর বলব! তোর বাবা বিয়ে করেছিল কাম চরিতার্থ করার জন্য। কাম শুধু কাম।'

মা সমুদ্রস্নান না করেই সমুদ্র দেখল—শুধু একবার নয়, পরে আরও একবার। বাবার প্রভিডেন্টফান্ডের টাকায় তৈরি বাড়ি ততদিনে শেষ। সেই বাড়িখানির দলিল মায়ের নামেই করেছিল বাবা। দ্বিতীয়বার তারা হোটেলে খেয়েছিল। আর মুহূর্তের অসচেতনতায় তার চশমা ভেসে গিয়েছিল পুরীর সমুদ্রে।

চশমা ছাড়া অন্যদের মতো আমারও দেখতে অসুবিধে হয়। সমুদ্র কোনও কোনও জিনিস নিলে আর ফিরিয়ে দেয় না—যেমন চশমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইটেম আর দরজা দু-ভাগে ভেঙে জোড়া লাগানো হয়েছে এই *অন্দরবেলা*। আইটেম শব্দটা বাঙালি জীবনে যে আজ কতরকম মানে নিয়ে আসে। জিনিস তো আর জিনিস নয়, সংস্কৃতির অঙ্গ , ব্যক্তি মনের আনন্দ বিষাদে লগ্ন। ইদানীং বাঙালি গেরস্তালি গোছানোতে খুবই স্মার্ট হয়েছে, পণ্যরতি উস্‌কে তোলা সম্ভারে তাদের ঘর ভরেছে। এইসব চকচকে আইটেম সং-এর মতো আবেদনঘন বস্তুসমূহের তলায় ক্রমেই চাপা পড়ে যাচ্ছে আরেক রকম বাঙালি জীবন। অনতি অতীত সেই জীবনের স্বাদ আইটেম অংশে ধরা রইল।

এই অনতি অতীতে বাঙালির মন বিকেলের চাপা আলোর মতোই রহস্যময় নানা অবদমিত ইচ্ছায় ভরা থাকত। অপ্রকাশ্য, অনুচ্চারিত সেই সব ইচ্ছে নানা রূপে রূপান্তরে লেগে থাকত ঘরে-বাইরে। সেগুলোর কথা খেয়াল না থাকলে বাঙালি গেরস্তালিকে চেনা যাবে না। দরজা খুলে সেখানে ঢুকতে হবে। দেখা যাবে নানা জিনিসে চাপা ইচ্ছের গন্ধ মাখামাখি হয়ে আছে।

ISBN 978-93-80869-56-8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি মধ্যবিত্তের গেরস্তালিতে নানা জিনিসের আসা যাওয়া —
বাহির বদলায়,বদলায় অন্দরও। হুক ছেঁড়া নিউলুক ব্রা,
ব্লাউজের সেফটিপিন, রান্নাঘরের জাল আলমারি,
বিলিতি কন্ডোম, ক্লিক থ্রি ক্যামেরা, ডি সি ফ্যান—
এসব ছুঁয়ে ছুঁয়েই গত শতকের বাঙালির অন্দরবেলার কথকতা
ধরা হল এক-মলাটে।

9 789380 869568

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~